ব্রহ্মার হাসি

প্রমথনাথ বিশী

মডার্ন বুকস লিঃ
১৬০/১এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

সূচীপত্র

ব্রহ্মার হাসি

আমাদের পাড়ার ভুলু সকাল হইতে ভাবিতেছিল আজ সে 'দি হেভেন' সিনেমায় ছবি দেখিতে যাইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া সে যাত্রাও করিয়াছিল—কিন্তু সিনেমা অবধি পৌঁছিবার আগেই সম্প্রদায়বিশেষের ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া সে সোজা স্বর্গে চলিয়া গেল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এত স্থান থাকিতে ভুলু স্বর্গে গেল কেন? প্রথমতঃ আমরা প্রাচীন কুসংস্কারের বশে ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থান আছে বলিয়া ভাবি, বস্তুতঃ তত স্থান নাই। জগতে তিনটি মাত্র স্থান আছে, স্বর্গ, নরক ও সিনেমা। দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রে বলিয়াছে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য', বাকিটুকু সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্র জানিতে আজকাল আর শাস্ত্রজ্ঞ হইবার প্রয়োজন করে না। ভুলুর ভাবনা ছিল 'দি হেভেন'-এর জন্য—কাজেই সে মূল 'হেভেন' অর্থাৎ স্বর্গে চলিয়া গেল। ইহাতে ভুলু খুব যে বেশী খুশী হইয়াছিল, বলিতে পারি না—কে-ই বা হয়?

যাই হোক সে যাত্রাপথের প্রান্তে দেখিতে পাইল প্রাচীর-ঘেরা জেলখানার মত একটা জায়গা, তবে তার দরজা একেবারে উন্মুক্ত। সে সোজা ঢুকিয়া পড়িল। সে দেখিল, রাস্তার দুই পাশে বড় বড় সব বাড়ী—তাহাদের গায়ে 'টু লেট' লেখা কাঠের খণ্ড স্বর্গীয় বাতাসে দুলিয়া ঠুক ঠাক শব্দ করিতেছে। ওই শব্দটুকু শুনিয়া ভুলু বুঝিতে পারিল স্থানটার নিস্তব্ধতা কি গভীর। তখন তাহার প্রথম চৈতন্য হইল যে, আশেপাশে কোথাও লোকজন নাই। সে ভাবিল—এ কোথায় আসিলাম?

কলিকাতা শহর নিশ্চয় নয়, সেখানে তো এমন করিয়া 'টু লেট'-এর মাদুলি বাতাসে দোলে না!

কিছুদূর আসিয়া সে দেখিল, একটি বৃদ্ধ বড় একটা গাছের ছায়ায় চারপায়ার উপর আরামে ঘুমাইতেছে। আরও একটু কাছে আসিলে দেখিল, একি কাণ্ড! গাছের ডালে বাঁধা একটি ভাঁড়ের যুগল-রন্ধ্র-নির্গত কি একটা বস্তু ফোঁটা ফোঁটা তাহার দুই নাসারন্ধ্রে পড়িতেছে। একটু হাতে লইয়া শুঁকিয়া দেখিয়া ভুলু বুঝিল উহা আর কিছুই নয়, পৃথিবীতে যাহা সর্ষপ তৈল বলিয়া এক সময়ে বিখ্যাত ছিল, সেই বস্তু। বৃদ্ধের অটোমেটিক নিদ্রা-কৌশল দেখিয়া ভুলু বিস্মিত হইয়া গেল, ভাবিল ইহার পরিচয় না লইয়া যাওয়া হইবে না। নাকে তৈল দিয়া ঘুমানো মনুষ্য-জীবনের আদর্শ। কিন্তু নাকে তৈল নিষেক করিতেও একটু পরিশ্রম করিতে হয়—বৃদ্ধ তাহাও বাতিল করিয়া দিয়াছে। ভুলু মনে মনে বলিতে লাগিল ধন্য কৌশল, ধন্য প্রতিভা।

ভুলু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না সে কোথায় আসিয়াছে। তখন সে অনেক কৌশল ও অনেক প্রযত্ন করিয়া বৃদ্ধের ঘুম ভাঙাইল। বিরক্ত বৃদ্ধ বলিল—বাপু একটু বিশ্রাম করিতে-ছিলাম, তা বুঝি পছন্দ হইল না?

ভুলু বলিল—মহাশয়, চটিবেন না। আমি কোথায় আসিয়াছি?

বৃদ্ধ বলিল—এ স্থানের নাম স্বর্গ!

ভুলু পুনরপি শুধাইল—ইহাই কি 'হেভেন?'

বৃদ্ধ বলিল—'হেভেন' ও বলিতে পারো—তবে আমরা

স্বর্গ নামটিই পচ্ছন্দ করি।

তখন ভুলু বলিল—কিন্তু ছবি কোথায়? কখন ছবি দেখানো হইবে?

বৃদ্ধ বলিল—ছবি আবার কি? যাহা দেখিতেছ তাহাই কি যথেস্ট নয়?

ভুলু বলিল—আমরা গৌড়বাসী। ছবির পর্দায় কোন বস্তু অনূদিত না দেখিলে আমাদের বোধগম্য হয় না—আমরা জাত-শিল্পী কি না।

নিদ্রাভঙ্গজনিত বিরক্তিভরে বৃদ্ধ বলিল—ছবিটবি এখানে নাই। আর থাকিবেই বা কি প্রকারে? লোকজন কি এখানে কেউ আছে? বাড়িঘর সব খালি দেখিতেছ না? আমি একাই আছি।

ভুলু শুধাইল—মহাশয়ের নাম কি?

বৃদ্ধ বলিল—ব্রহ্মা।

ভুলু চমকাইয়া বলিল—কোন ব্রহ্মা?

—ব্রহ্মা আবার কয়জন? স্বষ্টিকর্তা ব্রহ্মা।

ভুলু তখন পা ছড়াইয়া বসিয়া উচ্চৈস্বরে বিলাপ করিতে শুরু করিল—এ কোথায় এনু গো? এখানে সিনেমা নেই। এর চেয়ে যে সাঁওতাল পরগণার মাঠ অনেক ভালো। ওগো, ব্রহ্মা তুমি আমাকে কল্‌কাতা শহরে রেখে এসো গো।

তারপর সে আরম্ভ করিল—

‘তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম

তোমারি প্রতিমা গড়ি

মন্দিরে মন্দিরে

বাহুতে তুমি মা শক্তি

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে !'

ভাবের আবেগে কথাগুলি কিছু উল্টাপাল্টা হইয়া গেল।

ব্রহ্মা শুধাইল—ও আবার কি ?

ভুলু বলিল—আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। খোঁড়া লোক যেমন লাঠি না হইলে চলিতে পারে না, আমরা তেমনি জাতীয় সঙ্গীত ছাড়া বিলাপ করিতে পারি না।

সে আবার আরম্ভ করিল—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

কমলা কমলদলনিবাসিনী

নমামি তারিণীং

রিপুদল বারিণীং

বহুবল ধারিণীং মাতরং।'

ব্রহ্মা মহেন্দ্র সিংহের মতো প্রশ্ন করিল—কে তোমাদের মা ?

গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ভুলু বলিল—সি-নে-মা।

ব্রহ্মা তাহার মাতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বলিল—ধন্য মাতৃভক্তি। নিজের মাতা নাই মনে করিয়া তাহার ক্ষোভ হইতে লাগিল। প্রকাশ্যে বলিল—ধন্য তোমার মাতৃভক্তি।

ভুলু বলিল—আমরা গৌড়বাসী! আমাদের মারো, কাটো অনশনে রাখো manhole-এ নিক্ষেপ করো, আমাদের উপর

প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চালাও, সমস্ত দেশটাকে 'নোয়াখালি' করিয়া দাও, কিছুতেই আমাদের দুঃখ নাই—কিন্তু সিনেমায় হস্তক্ষেপ করিলে আমরা সহ্য করিব না কারণ—'তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।'

সে বলিল—কালকাতায় এখন সাঁঝবাতি আইন চলিতেছে তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই—বরঞ্চ লাভ, কারণ অধিকাংশের ঘরে সাঁঝবাতি জ্বালিবার তৈলেরই অভাব—কিন্তু ওই আইনের ফলে সিনেমায় একটা 'শো' বন্ধ হইয়া গিয়াছে—এ দুঃখ তাহারা কোথায় রাখিবে ?

ব্রহ্মা শুধাইল—তখন গৌড়বাসীরা কি করে ?

—কি আর করিবে ? অগত্যা ওই সময়টা তাহারা দেশের বিষয় চিন্তা করিয়া কাটায়।

ব্রহ্মা বলিল—ওই যে নোয়াখালীর উল্লেখ করিলে সেখানে যাওনা কেন ?

ভুলু বলিল—সেখানে যে সিনেমা নাই। তারপরে সোৎসাহে শুরু করিল—সেখানে গোটা কতক সিনেমা খুলিয়া দাও, দেখো আমরা যাই কি না যাই ?

—সেখানে কেহই কি যায় নাই ?

—একটা আটাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ গিয়াছে কিন্তু লজ্জার কথা কি আর বলিব, শুনিয়াছি তোমরা অন্তর্যামী, না বলিলেও জানিবে, তাই বলিয়াই ফেলি—সে লোকটা চার্লি চ্যাপলিনের নাম অবধি শোনে নাই।

ব্রহ্মা বলিল—আমিও এই প্রথম শুনিলাম।

ভুলু সরোষে বলিল—তবে তুমিও নোয়াখালি যাও।

তারপরে পুনরায় করুণ বেহাগে আরম্ভ করিল—ওগো এ কোথায় এনুগো—আমাকে কল্‌কাতায় রেখে এসো।

ব্রহ্মা বিরক্ত হইয়া ভুলুকে এক চড় মারিল। সে শুকনো পাতার মতো উড়িতে উড়িতে কলিকাতায় চলিল। ব্রহ্মা নিজে নোয়াখালি চলিল।

ভুলু হাসপাতালে পাশ ফিরিল। ডাক্তার বলিল—এ যাত্রা বোধ করি বাঁচিয়া উঠিল।

ব্রহ্মা নোয়াখালির চৌমুহানি নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল।

ব্রহ্মা চৌমুহানি পৌঁছিয়া দেখিল ভারি এক সভা বসিয়াছে। কুম্ভীর খাঁ নামে এক উজীর বক্তৃতা করিতেছে। সে বুক চাপড়াইতেছে আর বলিতেছে—হায়, হায় এমন কাজ কে করিল? কে এমন সর্ব্বনাশ করিয়া গেল? আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াছি—কিন্তু আসামীদের খুঁজিয়া পাইলাম না। এ সমস্তই বহিরাগতের কাজ। বাহির হইতে গুণ্ডাদল আসিয়া এই কাজ করিয়া গিয়াছে। এখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় একেবারে নিরাপরাধ—তাই তাহাদের গ্রেপ্তার করি নাই। বিশ্বাস না হয়—দেখিয়া এসো—এখনো তাহারা আগের মতো শান্তভাবে চাষবাস করিতেছে। তোমরা তাহাদের কিছু বলিও না—তাহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সে এইভাবে কথা বলিতেছে—আর তাহার চোখ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে—সেই জলপ্রবাহ খাল বাহিয়া

ছুটিয়াছে এবং একটি বৃহৎ কুণ্ডে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। সেখানে একদল লোক, বোধহয় তাহারা বহিরাগত গুণ্ডার দল, ছুরি ছোরা, তরোয়াল, লোহার দণ্ড প্রভৃতি ধুইতেছে। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র রক্তে লাল। সেই রক্তে কুণ্ডের জল লাল হইয়া উঠিয়াছে। আর একদল লোক সেই রক্তবর্ণ জল শিশি, বোতলে ভরিয়া প্রস্থান করিতেছে। তাহারা হাঁকিয়া বলিতেছে অতি উত্তম রক্তবর্ধক সালসা, মূল্য বোতল প্রতি এক টাকা মাত্র। এই সালসা পান করিলে রক্তাল্প ব্যক্তির রক্তবর্ধন হইবে। একেবারে অব্যর্থ। কিনিয়া লও। বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবে!

ব্রহ্মা বুঝিল—হাঁ ইহাদের তুলনা নাই। সে যে মানুষ না হইয়া নিতান্ত দেবতা হইয়া জন্মাইয়াছে সেজন্য সে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা চারিদিকে হাজার হাজার দুর্গতের দেখা পাইল। তাহার মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ। তাহাদের মধ্যে অনেকের গায়েই আঘাতের চিহ্ন, কিন্তু কাহারো গায়ে বস্ত্রের চিহ্ন নাই। তাহারা শীতে কাঁপিতেছে, ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছে—বলির পশুর মতো তাহাদের মুখে এক প্রকার অসহায় ভীতির ভাব।

ব্রহ্মা আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে—একশতের কাছাকাছি হইবে। সেখানে দলে দলে যুবক-যুবতী নানা বর্ণের 'ব্যাজ' ধারণ করিয়া উপবিষ্ট—সকাল বেলায় তাহারা গ্রামোফোন সঙ্গীত সহকারে

চা ও বিস্কুট গলাধঃকরণ করিতেছে। ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র কয়েকজন যুবক-যুবতী ছুটিয়া আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপরে পড়িল—বলিল—আমাদের তাঁবুতে এসো। আমাদের Ideology-টা তোমাকে বুঝাইয়া দিই। এই বলিয়া পকেট হইতে একটি ফুটো পয়সা বাহির করিয়া বুঝাইতে লাগিল—বুড়ো, ছোটবেলায় তোমার ঠাকুর-মার কাছে নিশ্চয় শুনিয়াছ যে বাসুকীর মাথায় পৃথিবী ন্যস্ত। তাহা নিতান্তই ঠাকুর-মার উপকথা। পৃথিবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এই পয়সার উপরে। ইহার নাম 'জগতের আর্থিক ব্যাখ্যা'। তুমি যদি আমাদের ক্যাম্পে আগমন করো—তবে এই সব দুরুহ তত্ত্ব তোমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিব আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি রাশিয়ান কম্বল পাইবে—আর যদি উহাদের ক্যাম্পে যাও, তবে তোমার দুর্গতির অন্ত থাকিবে না, ক্যাপিট্যালিস্টদের চাপে তোমার জীবনান্ত ঘটিবে।

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই চার-পাঁচজন যুবক আসিয়া তাহার হাত ধরিল—এসো, এসো, বুড়ো আমাদের ক্যাম্পে।

একজন তাহার একখানি ছবি তুলিয়া লইল। আর একজন কাগজ-কলম লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল—একটা বিবৃতি দাও। ছবি শুদ্ধ আমরা ছাপাইয়া দিব।

ব্রহ্মা কিংকর্তব্য স্থির করিবার পূর্বেই আরও পাঁচ সাত দল আসিয়া তীর্থের পাণ্ডার মতো তাহাকে লইয়া টানাটানি শুরু করিয়া দিল। তাহাদের মধ্যে যাহার দৈহিক শক্তি সবচেয়ে বেশি সে-ব্রহ্মাকে টানিয়া লইয়া নিজেদের ক্যাম্পে

গিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা একখানি ভাঙা চেয়ারের উপরে বসিল। যুবকটি তাহাকে নিজেদের Ideology বুঝাইতে লাগিল।

ব্রহ্মা বলিল—কিছু খাইতে পাইব কি?

যুবকটি বলিল—বৃদ্ধ, তুমি নিতান্তই সাম্রাজ্যবাদী। নতুবা এমন Ideologyর ব্যাখ্যার সময়ে তোমার খাদ্যের কথা মনে পড়ে?

ব্রহ্মা বলিল—কেন, বাপু, তোমরা ত বেশ খাইতেছ।

সত্য সত্যই তাঁবুর এক দিকে বসিয়া কয়েকজন লোক cheese দিয়া পাঁউরুটি খাইতেছিল।

ব্রহ্মা বলিল—Ideologyর চেয়ে এখন কি খাদ্যের প্রয়োজন বেশী নয়?

যুবকটি বলিল—অন্ন, বস্ত্র এবং ঔষধের ব্যবস্থাও আছে।

—কোথায়?

—শ্রীরামপুরে

—কে করিতেছেন?

—তিনি

—ব্রহ্মা শুধাইল—তাঁহার বয়স কত?

—আটাত্তর বৎসর

ব্রহ্মা শুধাইল—তবে তোমরা কি করিতেছ?

যুবকটি বলিল—আমরা Ideology প্রচার করিতেছি। তত্ত্ব প্রচার করিবার এমন সুযোগ আর পাইব কোথায়? দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা এবং সাম্প্রদায়িক অত্যাচার Ideology প্রচারের

প্রশস্ততম সময়। অন্য সময়ে লোকে এসব কথায় কান দিতে চায় না, চাষবাস লইয়াই থাকে। এখন তাহারা এসব না শুনিয়া যায় কোথায় ?

—তোমরা জাতির দুর্দশার কথা ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়াই মনে হইতেছে—

যুবকটি সদম্ভে বলিল—কখনোই না। দেখনা আমি কি রকম জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে পারি—এই বলিয়া সে তাল লয় সংযোগে আরম্ভ করিল—

"সুজলাং সুফলাং মাতরম্
মাতরম্—মা—মা—মা—মা—
আ—আ—আ— চা—চা—চা—চা—"

তাহার চা—চা—আহ্বান শুনিয়া একজন উর্দিপরা আরদালি দ্রুত চা, বিস্কুট লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুবকটি চায়ের কাপে মনোনিবেশ করিতেই ব্রহ্মা তাঁবু হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। তাঁবুর সকলে তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিল—বলিতে লাগিল—গেল গেল লোক [illegible] বিবৃতি না দিয়াই গেল। কেহ বলিল—লোকটা বোধকরি কু[illegible]র খাঁ-র চর, কেহ বলিল—সাম্রাজ্যবাদীর লোক। সকলেই বলিল—আজকালকার দিনে কৃতজ্ঞতার একেবারেই অভাব। তখন কৃতঘ্নতার শোক ভুলিবার উদ্দেশ্যে সকলে জাতীয় সঙ্গীত সহযোগে প্রাতঃকালীন দশম পেয়ালা চায়ে মনোনিবেশ করিল। ধাবমান ব্রহ্মার কানে দূর হইতে আসিতেছিল —মা—মা—মা—চা—চা—চা।

ব্রহ্মা ছুটিতে ছুটিতে দেখিতে পাইল চারিদিকে দগ্ধ পল্লীর অবশেষ, নরকঙ্কাল আর নর-করোটি। ব্রহ্মা দেখিল বৃহৎ সব অট্টালিকা অর্ধদগ্ধ—বিপণি ও বাজার লুণ্ঠিত, এমন কি সুপারির বাগানগুলি পর্যন্ত অগ্নিতে ঝলসিত হইয়া দণ্ডায়মান। ব্রহ্মা বুঝিল এ সমস্তই বহিরাগত দুর্বৃত্তের কাণ্ড। ছুটিতে ছুটিতে সে একটি ছোট্ট গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গ্রামটিও বহিরাগতের উপদ্রবে ধর্ষিত। সেখানে ছোট একখানি টিনের চালাঘরে একজন বৃদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিল—তাহার নিকটে কয়েকজন মানুষের ভগ্নাবশেষ। চারিদিকের ধ্বংস ও অস্থিরতার মধ্যে বৃদ্ধের অতুলনীয় স্থিরতা ও শান্তি একপ্রকার অপার্থিব মোহ বিস্তার করিয়াছে। তাহার মনে হইল এই বৃদ্ধ কে? তাহার মস্তক মুণ্ডিত, কটিলগ্ন শুভ্রবাস, নগ্ন গাত্র। হস্তিনাপুরের ধ্বংসের উপরে করুণ সন্ধ্যা তারার মতো তাহার চক্ষু দুইটি অপরিমেয় সান্ত্বনা বিস্তার করিতেছে। ব্রহ্মা তাহার কাছে গিয়া বলিল—আমাকে তোমার Ideology-টা একটু বুঝাইয়া দাও।

বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া লইয়া একজন সঙ্গীকে বলিল—নির্মলকুমার, এই ভাইকে খাদ্য দাও।

ব্রহ্মা চমকাইয়া উঠিল—এ পর্যন্ত খাদ্যের কথা কেহ তাহাকে বলে নাই—সবাই তত্ত্বের কথা মাত্র বলিয়াছে। বিস্মিত ব্রহ্মা বলিল—একবার জাতীয় সঙ্গীতটা শুনিতে পাই না!

বৃদ্ধ বলিল—এই ভাইকে একখানা কম্বল দাও।

—কম্বল? জাতীয় সঙ্গীত নয়?

তাহার বিস্ময় দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল—দুর্গতের নিকটে অন্ন-

বস্তুরূপ ব্যতীত ভগবানের অন্য কোন রূপ নাই। ব্রহ্মা আহার সমাধা করিলে ও কম্বল গায়ে দিলে বৃদ্ধ একখানি লাঠি ও একটি পুঁটুলী লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ব্রহ্মা দেখিল—বৃদ্ধটি সুপারির গাছের সাঁকো পার হইয়া মাঠ ভাঙিয়া সন্ধ্যার ছায়াঘন দিগন্তের দিকে চলিয়াছে—নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ।

তাহার মনে হইল বৃদ্ধের উন্নত মস্তক আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে—সমস্ত পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া কেবল সেই দিব্যমূর্তিটি মাত্র আছে—আর কিছুই নাই—আর সবই যেন মায়া। তখন তাহার মনে হইল, সবাই এই বৃদ্ধটির কথাই বলিয়াছিল—সবাই এই একক বৃদ্ধের উপরে সেবার ভার দিয়া Ideology ও জাতীয় সঙ্গীত প্রচার করিতেছে।

ব্রহ্মা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। বিশ্বসৃষ্টির পর হইতে সে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল—এই সে প্রথম হাসিল। সে হাসির আঘাতে মানস সরোবরে ঢেউ উঠিল, আকাশে তারা ফুটিল, তারায় জ্যোতি ফুটিল, পৃথিবী হরিৎ হইল, আকাশ নীল হইল, স্বর্গচ্যুত দেবতারা আবার স্বর্গে ফিরিয়া অধিষ্ঠিত হইল—মানুষ আবার মনুষ্যত্ব লাভ করিল। ব্রহ্মাণ্ড চটকা ভাঙিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেই হাসির আঘাতে নির্বাসিত সত্য, সৌন্দর্য, আনন্দ মানুষের অন্তরে পুনঃ স্থাপিত হইল। সেই হাসির দিব্য জ্যোতিতে মানুষ দিব্যদৃষ্টি পাইল। ব্রহ্মার হাসিতে ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইল—মানুষের নবজন্ম লাভ ঘটিল। সেই হাসি বিশ্বে এখনো ধ্বনিত হইতেছে—কবি ও সাধকগণের দিব্যকর্ণ তাহা শুনিতে পায়।

গণ্ডার

আসামের গভীর অরণ্যে খড়্গনাসা নামে এক গণ্ডার বাস করিত। সে অন্যান্য গণ্ডার-দলের সহিত নলখাগড়া-বেষ্টিত পল্বলে ডুব দিয়া ও সাঁতার কাটিয়া দীর্ঘ দিন যাপন করিত, খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিত এবং জ্যোৎস্না রাত্রিতে মাঠের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। কিন্তু তাহার মনে সুখ ছিল না। অন্যান্য গণ্ডারগণ তাহাকে বড়ই অবহেলা করিত। গণ্ডারের চামড়া যে অত্যন্ত পুরু, এই সত্য এখন মানুষেও জানিয়া ফেলিয়াছে এবং এই কঠিন সত্য লইয়া গণ্ডার-কুল গৌরব করিয়া থাকে। খড়্গনাসার চামড়া আশানুরূপ পুরু ছিল না বলিয়া তাহার দলের গণ্ডারসমূহ ঠাট্টা করিত, তাহাকে বলিত, তোমার চামড়া মানুষের মতো কোমল, তোমার গণ্ডারকুলে না জন্মিয়া মানুষের ঘরে জন্ম লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জন্মটা তো আর তাহার হাতে নয়, কাজেই কেন যে এই অপরাধের শাস্তি ভোগ করিবে তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটিল। সেই অরণ্য-প্রদেশের গণ্ডাররাজের দেহান্ত ঘটিলে শ্রাদ্ধোপলক্ষে আর সকলেরই নিমন্ত্রণ

হইল, কেবল খড়গনাসা নিমন্ত্রিত হইল না। ইহাতে সে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করিয়া আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু মরিবার উপায় কি? সে শুনিয়াছিল, মানুষেরা অনেক সময়ে দম্পতি-কলহের পরিণামে গলায় দড়ি দিয়া মরে। কিন্তু দড়ি,—তাহার দেহভার বহন করিতে সক্ষম এমন শক্ত দড়ি, সে পাইবে কোথায়? আর দড়ি পাইলেই বা গলা পাইবে কোথায়? গণ্ডারের মুণ্ডুর সঙ্গেই দেহটা যুক্ত—বিধাতা গলা দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কাজেই সে স্থির করিল যে, প্রায়োপবেশনে বিধাতার তপস্যা করিবে। তপে সন্তুষ্ট হইয়া বিধাতা-পুরুষ আবির্ভূত হইলে সে একটা গলা চাহিয়া লইবে এবং তার পরে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়া সমস্ত জ্বালার অবসান করিয়া ফেলিবে।

খড়্গনাসা বিষম তপস্যা সুরু করিয়া দিল। সেই তপস্যার খ্যাতি কিম্বদন্তী আকারে এখনো আসামপ্রদেশে প্রচলিত আছে। অনেকে হয় তো তাহা শুনিয়াও থাকিবেন। দীর্ঘকাল তপস্যার পরে বিধাতা সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সম্মুখে এক দিন সত্য সত্যই আবির্ভূত হইলেন। খড়্গনাসা তাহাকে মনের দুঃখ নিবেদন করিলে বিধাতা বলিলেন—বৎস একটা গলা লইয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিলে আর এমন কি লাভ? তার চেয়ে তুমি মনুষ্যকুলেই জন্মগ্রহণ করো না কেন? মনুষ্যত্ব লাভ করিলে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে। খড়্গনাসা এই প্রস্তাবে আশাতীত আনন্দিত হইল এবং মানুষকুলে জন্মিবার বর লাভ করিল। বিধাতা অন্তর্ধান করিলেন।

পরজন্মে খড়্গনাসা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিল। সে মানুষ হইল বটে কিন্তু তাহার নাসিকাটির পূর্বজন্মসুলভ উচ্চতার হ্রাস হইল না। তাহার বিচিত্র নাকটি দেখিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাকে গণ্ডার বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতামাতা অবশ্যই তাহাকে একটা শ্রুতিমনোহর নাম দিয়াছিল—কিন্তু সেটা ওই গণ্ডার নামের তলে চাপা পড়িয়া গেল। মনুষ্য-সমাজে তাহার গণ্ডার নামই প্রচলিত রহিল। সমবয়স্ক বালকদের সহিত খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গেলে সেই আঘাতে তাহার কিছুই হইত না। ছেলেরা বিদ্রূপ করিয়া বলিত, বেটার গণ্ডারের চামড়া। এই কথায় ক্ষীণ পূর্ব্বস্মৃতিবৎ তাহার মনে উদিত হইত—ইহার বিপরীত কথা কোথায় যেন, কবে যেন সে শুনিয়াছে—কিন্তু ঠিক কবে এবং কোথায় তাহার মনে পড়িত না।

গণেশ (ইহাই তাহার পিতৃদত্ত নাম) পাঠশালায় ঢুকিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িল। ছেলেরা কড়াকিয়া পড়িবার সময়ে সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিত 'চার কড়ায় এক গণ্ডার' ! আর সবাই হোহো করিয়া হাসিতে থাকিত। গুরু মহাশয় ঘুম ভাঙিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিতেন—হাঁ রে, হাসছিস্ কেনে ? সবাই বলিত, দেখুন না, গণেশ কি রকম করছে ? গণেশ বলিত—ওরাই আমাকে ক্ষেপাচ্ছে—আমাকে গণ্ডার বলছিল। গুরু মহাশয় গণেশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতেন—তা তুই ও-রকম মুখ ক'রে আছিস্ কেন ? গণেশ বুঝিতেই পারিত না, চুপ করিয়া থাকিত। অপরাধীর নীরবতাই অনেক ক্ষেত্রে তাহার

অপরাধের প্রমাণ। গুরু মহাশয় বেতগাছা হাতে করিয়া তাহার উপরে পড়িতেন, বলিতেন—তুই গণ্ডার ছাড়া আর কি, একশোবার গণ্ডার, এত শক্ত কি মানুষের চামড়া? বেতগাছা ভাঙিত, গণেশ ভাঙিত না, কাজেই প্রমাণ হইয়া যাইত, সে গণ্ডার ছাড়া কিছুই নয়।

অতঃপর গণ্ডার হাই-স্কুলে প্রবেশ করিল। হাই-স্কুল শব্দটি সে আগেই শুনিয়াছিল এবং তাহার ধারণা হইয়াছিল, তাহা কোন একটা উচ্চ বস্তু হইবে। কিন্তু স্কুল-গৃহটি আর দশটি গৃহের মতোই বলিয়া তাহার মনে হইল, কাজেই সে 'হাই' শব্দের সার্থকতা বুঝিতে না পারিয়া হেড-মাষ্টার মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইল। হেড-মাষ্টার তো তাহার প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্। সত্য কথা বলিতে কি, হাই-স্কুল কেন যে 'হাই' তাহা তিনিও জানেন না। কিন্তু কোন ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে জানি না বলা আর নিজের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ স্বাক্ষর করা একই কথা। এ রকম ক্ষেত্রে একমাত্র যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহাই করিলেন, বিষম রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন—এ সব প্রশ্ন শিখিলে কোথায়? এই অল্প বয়সেই খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশতে শিখেছ, না?

হেড-মাষ্টারের উত্তর শুনিয়া তাহার কেমন যেন সন্দেহ হইল, 'হাই' শব্দের অর্থ হয় তো 'লো' হইবে। তবু সে দমিল না—শুধাইল—স্যর, হাই শব্দের অর্থ তো উচ্চ। ইহার পরে কোন হেড-মাষ্টারের পক্ষেই আর ধৈর্য্যধারণ সম্ভব নয়। তিনি হাঁকিয়া উঠিলেন—বেয়ারা, ওই পাজি ছেলেটাকে ধরো তো।

এই নির্দ্দেশ শুনিবা মাত্র গণ্ডার ছুটিয়া পলাইল। ছেলের দল তাহার পিছে-পিছে ছুটিল, অনেকেই তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত, তাহারা 'ওই গণ্ডার যায়, ওই গণ্ডার যায়' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হাইস্কুলে প্রবেশের প্রথম দিকেই তাহার গণ্ডার-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

এই ব্যাপার হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, তাহার হাই-স্কুলের জীবন বড় সুখের হইল না। 'তাহার উপরে অত্যাচার হইলে আগে সে রাগিত, তাহার রাগ দেখিয়া ছেলেরা গণ্ডার বলিয়া তাহাকে আরও বেশী করিয়া ক্ষেপাইত। এখন রাগ চাপিতে গিয়া সে কাঁদিয়া ফেলে—তাহার চোখের জল দেখিয়া ছেলেরা বলে—গণ্ডার দমকল খুলে দিয়েছে।

কিন্তু এ সংসারে কাহারো জীবন অনবচ্ছিন্ন দুঃখের নয়। দুর্ভাগ্যের দেয়াল নিরেট হইলেও তাহাতে জানালা থাকিতে বাধা নাই। স্কুলে একদিন ইন্‌সপেক্টার আসিলেন। তিনি গণ্ডারের ক্লাশে ঢুকিয়া ছাত্রদের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ভাগ্যের ইঙ্গিতে তাঁহার প্রথম প্রশ্নটি হইল—গণ্ডার সম্বন্ধে কি জানো, বলো? সকলে গণেশের দিকে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। ক্লাসের সেরা ছাত্রটি গণ্ডার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিল তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, উহা এক প্রকার চারখানি পা-বিশিষ্ট জীব। ইহার বেশি কেহই বলিতে পারিল না। ইন্‌সপেক্টার যখন বিরক্ত হইয়া ক্লাস পরিত্যাগ করিতে যাইবেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল গণেশের দিকে, বলিলেন—তুমি বলতে পারো? সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া গণেশ গণ্ডারের জীবন-

বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নিখুঁৎ একটি বর্ণনা দিল। ইন্‌সপেক্টার খুশী হইয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া হেড মাষ্টারকে বলিলেন—ভেরি-ইন্‌টেলিজেণ্ট—এর একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

ইন্‌সপেক্টার চলিয়া গেলে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—ও কেন পারবে না ? আর জন্মে ও গণ্ডার ছিল। যথাসময়ে গণেশ একটি স্কলারশিপ পাইল ; কিন্তু ছেলেরা তাহাকে স্কলারশিপ না বলিয়া তাহার নামকরণ করিল—'গণ্ডারশিপ'।

এইভাবে সুখে-দুঃখে গণেশের হাই-স্কুলের জীবন শেষ হইল।

স্কুলের বাহিরের জীবনও গণেশের পক্ষে যে খুব প্রীতিকর ছিল এমন নয়। পাড়ায় একটি মাত্র সরিষার তৈলের দোকান। সেখানে এমন ভিড়, এমন ঠেলাঠেলি, পরস্পরের গাত্রে এমন ঘর্ষণ যে কেহ পকেটে সরিষা ভরিয়া সেই ভিড়ে প্রবেশ করিলে সেই সরিষা হইতে তৈল বাহির হইয়া পড়িবে। এক দিন গণেশের মা বলিলেন,—ওরে, যা তেল নিয়ে আয়।

গণেশ বড়ই মাতৃভক্ত। সে অমনি একটি পাত্র লইয়া দৌড়িয়া গিয়া ভিড়ের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিল। এক ঘণ্টা পরে ছিন্নবস্ত্র, বিদীর্ণচর্ম্ম হইয়া এক পোয়া তৈলাক্ত এক প্রকার বস্তু লইয়া যখন সে বাহির হইল, তাহার গা জ্বালা করিতে লাগিল। তৈল নামক যে-বস্তু সে পাইয়াছিল তাহার অনেকটাই গেল ক্ষতস্থানে লাগাইতে। তার পর হইতে সে প্রায়ই ভাবিত লোকে কেন আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া আছে বলিয়া পরিহাস

করে ? মানুষের গায়ের চামড়াও তো কম পুরু নয়, নতুবা আমার গা কেন ক্ষত-বিক্ষত হইতে গেল ?

গণেশ জানিত না এবং অনেকেই জানে না যে, মানুষের গায়ের চামড়া বিধাতা ইচ্ছা করিয়াই মোটা করিয়া দিয়াছেন। নতুবা সংসারের মতো সংঘর্ষ-বহুল স্থানে মানুষে বাঁচিবে কি উপায়ে ? বিধাতা কেন যে মানুষের চামড়া আরও পুরু করিয়া দিলেন না, ইহাই তো মানুষের নালিশ হওয়া উচিত। গণ্ডারের চামড়া মোটা বটে কিন্তু মানুষের চামড়া ততোধিক মোটা, নতুবা পূর্ব্বজন্মের গণ্ডাররূপী গণেশের সংসারে এমন কষ্ট হইবে কেন ?

গণেশদের সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কাজেই তাহার বিবাহ দিবার জন্য পিতা-মাতার কর্ত্তব্য-বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিল। আর বাংলা দেশও এমন স্থান যে, এখানে আর্থিক অবস্থা ও বিবাহের তৎপরতা পরস্পর প্রতিকূল। গরীব এখানে শীঘ্র বিবাহ করিয়া ফেলে, ধনীর সন্তান বিবাহ করিতে চায় না। কিন্তু বোধ করি ভুল করিলাম, কেন না, বিবাহের অপেক্ষা বিবাহের চেয়ে বড়তে খরচ কিছু বেশি। স্ত্রীকে 'না' বলিয়া ক্ষান্ত করা যায়, কিন্তু ক্ষণিকাকে 'না' বলিতে সাহস হয় না। যাই হোক, শুভ লগ্নে গণেশের বিবাহ হইয়া গেল।

পাড়ার ছেলে-মেয়েরা আড়ালে গণেশের স্ত্রীকে গণ্ডারণী বলিয়া উল্লেখ করিত। একদিন পাড়ার একটি অবোধ বালক তাহাকে গণ্ডারমাসী বলিয়া সকলের সম্মুখে ডাকিয়া ফেলিল। সে দিন রাত্রে গণেশকে তাহার পত্নী জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ গো, সবাই আমাকে গণ্ডারমাসী, গণ্ডারণী বলিয়া ডাকে কেন বলিতে

পারো ? বলিতে পারিলেও গণেশের বলা উচিত ছিল না। কিন্তু গণেশের যে কেবল চামড়াখানাই কিছু মোটা ছিল এমন নয়, বুদ্ধিটাও মোটা ছিল। সে সবিস্তারে তাহার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া তাহার স্ত্রী বলিল— সত্যিকার গণ্ডারণীকে বিবাহ করাই তোমার উচিত ছিল। গণেশের জীবনে ধিক্কার জন্মিল। সে সেই রাত্রেই ঘরের জানালার শিক ভাঙিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

গণেশ পুস্তকে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কথা পড়িয়াছিল। ভাবিল, আমিও সেইরূপ গৃহত্যাগ করিব এবং তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। কিন্তু কোথায় যে তপসার অনুকূল বন, আর ঠিক কোন্ দিকে যে নৈরঞ্জনা নদী সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতে, বিশেষ সিদ্ধার্থের মতো রথ ও সারথীর ঐকান্তিক অভাব হওয়াতে, সে নিকটস্থ এক প্রান্তরে বসিয়া ভবিতব্যের চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, বিধাতা আমার চামড়া কেন মানুষের মতো করিয়া সৃষ্টি করিলেন না ? তাহা হইলে তো আমার এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। পূর্ব্বজন্মের তপস্যার কথা মনে পড়িলে সে বুঝিয়া বিস্মিত হইত যে, ঠিক ইহার বিপরীত প্রার্থনা সে এক সময়ে করিয়াছিল। সে দিন সে পুরু চামড়া চাহিয়াছিল, আর আজ তাহার প্রার্থনা কোমল চামড়া। কি পশুকুলে, কি নরকুলে কোথাও যে সন্তোষ নাই তাহাই কি ইহাতে প্রমাণ হয় না ? সে ভাবিতে লাগিল—হায়, মানুষ হইলাম তো চামড়াখানি মানুষের চর্ম্মসুলভ কোমলতা হইতে কেন বঞ্চিত হইল ! নির্ব্বোধ গণেশ জানিত না যে শুধু চামড়াখানি নয়,

তাহার বুদ্ধিও মনুষ্য সুলভ স্থিতিস্থাপকতা পায় নাই। গণ্ডারসুলভ একগুঁয়েমি বহন করিয়া সে মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

যখন সে এইরূপ চিন্তায় মগ্ন তখন শুনিতে পাইল কে যেন কোথা হইতে বলিতেছে—সম্পাদক হবি? সম্পাদক হবি? গণেশ চমকিয়া উঠিল? কে কথা বলে? কই, কাহাকেও তো দেখা যাইতেছে না! হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল গাছটির উঁচু একটি ডালের দিকে।

বাহুল্য বলিয়া প্রকাশ করি নাই যে, সে একটা গাছের নীচে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। কারণ বুদ্ধ, যুধিষ্ঠির, নিউটন, যিনি যখনই চিন্তা করুন না কেন, বৃক্ষতলে বসিয়াই চিন্তা করিয়াছেন। তবে গণেশের বেলাতেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইতে যাইবে কেন?

সে দেখিতে পাইল একটি শুক পক্ষী ক্রমাগত প্রশ্ন ধ্বনিত করিয়া যাইতেছে—সম্পাদক হবি? গণেশ শুধাইল—তুমি কে? শুক পক্ষী বলিল—আমি একটি শুক পক্ষী। কিন্তু এই সৌভাগ্য এইমাত্র লাভ করিয়াছি। কিছুক্ষণ আগে আমি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'জম্বুদ্বীপের' সম্পাদক ছিলাম। মৃত্যু হইবামাত্র আমি শুক-জন্ম লাভ করিয়া এই বৃক্ষটিতে আসিয়া বসিয়াছি। এখনো আমার মৃতদেহটা অফিসে পড়িয়া আছে, আর তাহার ফটো তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। নিশ্চয় এখনো নূতন সম্পাদক নিযুক্ত হয় নাই, যদি তোমার সম্পাদক হইবার ইচ্ছা থাকে তবে 'জম্বুদ্বীপ' আফিসে যাইতে পারো। এই কথা শুনিবা মাত্র পরিণাম অজ্ঞ, নির্বোধ গণেশ 'জম্বুদ্বীপ' পত্রিকার আফিসের

দিকে ছুটিল। তাহার সংসার-বৈরাগ্য যে নিতান্ত শ্মশান-বৈরাগ্য চতুর পাঠক তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন।

গণেশের যদি মনুষ্যসুলভ অভিজ্ঞতা থাকিত তবে শুক পক্ষীর মৃত্যুর বিবরণ নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু সে করে নাই বলিয়াই আমরা করিব না কেন? আর লেখকের সুবিধা এই যে, সে জিজ্ঞাসা না করিয়াও সব কথা জানিতে পায়। সম্পাদকের মৃত্যুর কারণ আর কিছুই নয়, একত্রিশ বৎসর ধরিয়া সংবাদপত্র সম্পাদনা করিতে করিতে, বাঁধা-বুলির পথে চলিতে চলিতে সম্পাদক মহাশয় একটি আধ্যাত্মিক শুক পক্ষীতে পরিণত হইয়াছিলেন, যদিচ দেহটি তখনো মানবীয় ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে এক দিন নর দেহের শাপ বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ শুক পক্ষীরূপে তিনি আকাশে উড্ডীন হইয়া গেলেন। ঘটনাটি এইরূপ: একদিন গঙ্গাতে স্নানাহ্নিক সমাধা করিয়া তিনি একটি সুপক্ক কদলী ভক্ষণ করিতে করিতে মনের আনন্দে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি দুষ্ট বায়স তাহার হাত হইতে অর্দ্ধ-ভুক্ত কদলীটি ছোঁ মারিয়া লইয়া পালাইল। সম্পাদক মহাশয় বিস্মিত রোষে পলায়মান বায়সটির দিকে তাকাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল—আহা তিনি যদি একটি পাখী হইতে পারিতেন তবে একবার কাকটিকে দেখাইয়া দিতেন, সম্পাদকের কলাতে অনধিকার-চর্চ্চার ফল কি বিষম হইতে পারে। যেমনি না এই ইচ্ছা হওয়া, অমনি তাঁহার অতীন্দ্রিয় সত্তা একটি শুক পক্ষীতে পরিণত হইয়া কাকের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তাঁহার আধিভৌতিক দেহ অসাড় হইয়া ভূপতিত হইল। সকলে

বলিল—তিনি সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়াছেন। কিন্তু কেহই আসল রহস্য জানিতে পারিল না। ইহাই সম্পাদকের শুক পক্ষী হইবার ভিতরকার কথা।

এদিকে গণেশ ছুটিতে ছুটিতে সংবাদপত্র আফিসে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাহার প্রার্থনা জানাইল। মালিক তাহার কথা শুনিয়া, তাহার গায়ের চামড়া হাত দিয়া টিপিয়া দেখিয়া তখনই তাহাকে সম্পাদক-পদে বসাইয়া দিলেন। গণেশ ভাবিল, এতদিনে বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন। হায়, গণেশ তোমার এখনও বুঝিতে বিলম্ব আছে যে বিধাতা-পুরুষ তোমার অপেক্ষা কম চতুর নহেন।

সম্পাদক হইয়া গণেশ প্রথম দিনেই বুঝিতে পারিল, এতদিনে তাহার স্থূল চর্ম্মের অনুরূপ কর্ম্ম জুটিয়াছে। সন্ধ্যা বেলায় যখন সে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে মালিক আসিয়া এক পদাঘাত করিয়া তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে গণেশের শরীর ক্ষত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার চামড়ার স্পর্শে মালিকের জুতার চামড়া ছিন্ন হইয়া মালিকের পায়ে রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। ইহার ফলে মালিক বুঝিতে পারিল, হাঁ, এত দিনে আঘাত-সহ সম্পাদক জুটিয়াছে—ইহাকে আর মারিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু মালিক ছাড়াও তো জগতে লোক আছে। তাহারা গণেশকে এত সহজে ছাড়িবে কেন? সদা-সর্ব্বদা নানাবিধ লোক নানারূপ বিরুদ্ধ প্রস্তাব লইয়া তাহার কাছে আসে। গণেশ যে ঘরটিতে বসে, তাহার চারিটি দ্বার। পূর্ব্বদ্বার দিয়া ধর্ম্মঘটকারিগণ যদি প্রবেশ করে, পশ্চিম দ্বার দিয়া ঢোকে ধর্ম্মঘট-

বিরোধী মালিকের দল।' তাহারা বাহির হইবা মাত্র উত্তর দ্বার দিয়া ঢোকে ধর্ম্মঘটের সমর্থকগণ, আর দক্ষিণ দ্বার-পথে ধর্ম্মঘটের প্রতিবাদিগণ প্রবেশ করে। যে-কোন পাকা সম্পাদকের এই চতুরঙ্গ আক্রমণে কাতর হইয়া পড়িবার কথা—কিন্তু গণেশের গণ্ডার-সত্তা কিছুমাত্র কাতর হয় না। সে সকলের বক্তব্যই সমান ঔৎসুক্যের সহিত শ্রবণ করে, সকলকেই সে সমান খুশী করিয়া বিদায় দেয় এবং কাহারো স্বপক্ষে কিছু লেখে না। ইহাতে সকলেরই সমান অসন্তুষ্ট হইবার কথা কিন্তু গণেশের অদৃষ্টের বা চামড়ার সৌভাগ্য বশত সকলেই তাহার উপরে সমান খুশী হয়। ক্রমে তাহার সম্পাদক-খ্যাতি এত বিস্তৃত হইল যে তাহার পত্নীর কানেও গিয়া প্রবেশ করিল। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার পত্নী গণেশের বাড়ীতে আসিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল—'ওগো, তুমি কি পাষাণ, আমাকে কি একবারের জন্যও খবর দিতে নাই? আমি তোমার সংবাদের জন্য ভূ-ভারতের সর্ব্বত্র খুঁজিয়া মরিয়াছি, আর তুমি এখানে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ!' বিজ্ঞ পাঠক ও বিজ্ঞতর পাঠিকা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গণেশ-পত্নীর একটি বাক্যও সত্য নয়—কারণ বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ভীষণতম শত্রু হইয়া পড়ে। একজন দূরে গেলে অপরে সন্ধান করা দূরে থাকুক, পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। কিন্তু মুখে ইহা কেহ স্বীকার করিতে চাহে না। গণেশও মুখে স্বীকার না করিয়া, নিজের দোষ মানিয়া লইয়া পত্নীকে গৃহে গ্রহণ করিল এবং পত্নী পতিপ্রেমের আতিশয্য-জাত আগ্রহে তাহার

বাক্স ডেস্ক ঘর-দ্বারের চাবির গোছাটি সযত্নে অঞ্চল-প্রান্তে বাঁধিয়া ফেলিল। পতির চাবি সংগ্রহেরই সামাজিক নাম পাতিব্রত্য। যে স্ত্রী যত সত্বর, যত কৌশলে পতির চাবি সংগ্রহ করিতে পারে সে তত অধিক সাধ্বী।

দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগের পর গণ্ডার-চর্ম্মা গণেশ সম্পাদক-জীবনে আসিয়া মানবজন্মের চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। গণেশের ধারালো কলমের আঘাতে অন্যান্য কাগজের সম্পাদকগণ ভয়ে তটস্থ—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদের আঘাতে গণেশ গণ্ডারবৎ অটল। অন্যান্য কাগজ বলাবলি করে, লোকটা কি গণ্ডার ছিল নাকি ? হায় সম্পাদককুল, তোমরা অনেক রহস্যই জানো, কিন্তু সব রহস্য তোমাদের আয়ত্ত নয়! 'ছিল না কি' নিতান্ত বাহুল্য—গণেশ সশরীরে একটি গণ্ডার। গণেশ নিরন্তর প্রার্থনা করে বিধাতা, আমার চামড়া আরও পুরু করিয়া দাও—আরও, আরও। কিন্তু লোকে যাহাই ভাবুক বিধাতার সাধ্যের একটা সীমা আছে। তাই তিনি গণেশের উপরে বিরক্ত হইয়া গণেশের সম্পাদক-জীবন অবসানের নির্দ্দেশ দিলেন।

এবারে আমি যে ঘটনাটি বলিতে যাইতেছি তাহা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত আকারে পাঠকগণ নিশ্চয় দেখিয়াছেন। কারণ কিছুকাল আগে 'জম্বুদ্বীপ সম্পাদকের অভাবনীয় মৃত্যু-রহস্য' নামে পতাকাসম্বলিত হেড লাইনে তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আসল হত্যাকারীকে ধরিতে না পারিয়া লোকে ইহাকে একটা সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বলিয়া মনে

করিয়াছিল—কিন্তু এমন সাম্প্রদায়িক হত্যা আর ঘটে নাই বলিলেও চলে।

একদিন রাত্রি দশ ঘটিকায় গণেশ যখন একাকী বসিয়া পর দিনের জন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতেছে—তখন সারা গায়ে শীতবস্ত্র পরিহিত কে একজন তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। গণেশ মুখ তুলিয়া বলিল—কি চান?

আগন্তুক বলিল—আপনাকেই চাই।

গণেশ শুধাইল—কেন?

আগন্তুক বলিল—নিতান্ত প্রয়োজন।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল—কোথা হইতে আসিতেছেন?

সে বলিল—আসাম।

গণেশ বলিল—বুঝিয়াছি। Grouping সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বুঝি?

সে বলিল—না।

গণেশ শুধাইল—তবে কি প্রয়োজন?

আগন্তুক বলিল—আপনার চামড়াখানি প্রয়োজন।

গণেশ বলিল—প্রয়োজন হইলেই বা পাইবেন কেন? আমার চলিবে কিরূপে? বিশেষ আপনি কে, তাহা তো এখনো জানিতে পারি নাই।

তখন আগন্তুক গাত্র হইতে শীতবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করতঃ স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—আমি আসামের অরণ্য-প্রদেশের গণ্ডাররাজ। সরল ভাষায় আমি একটি গণ্ডার।

গণেশ বিস্মিত না হইয়া বলিল—কিন্তু আমার চর্ম্মে কি প্রয়োজন ?

আসাম হইতে আগত গণ্ডার বলিল—আমার চামড়াই সব চেয়ে পুরু বলিয়া এত দিন আমার গৌরব ছিল, কিন্তু ওরে রে পাষণ্ড, তোর সম্পাদক-খ্যাতি প্রচারিত হইবার পরে আমার সমস্ত গৌরব ধূলিসাৎ হইয়্যছে। কাজেই তোকে হত্যা করিয়া তোর চামড়াখানি লইতে আমি আসিয়াছি।

গণেশ বলিল—কিন্তু আমাকে মারিলে কি নরহত্যার দায়ে পড়িবে না ?

গণ্ডাররাজ গর্জ্জন করিয়া বলিল—নিশ্চয়ই নয়। স্মরণ করিয়া দেখ তুই পূর্ব্বজন্মে গণ্ডার ছিলি আর এখনো তুই একটা আধ্যাত্মিক গণ্ডার।

গণেশ শান্তভাবে বলিল—আর্কিমিডিসের নাম শুনিয়াছ ?

গণ্ডাররাজ বলিল—সে আবার কি ?

গণেশ বলিল—সে একটি লোক। ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের তলে বসিয়া সে বলিয়াছিল যে, মারো কিন্তু বৃত্তটি নষ্ট করিও না। সেইরূপ আমিও তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আমাকে মারিতে চাও মারো কিন্তু এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি নষ্ট করিও না।

গণ্ডাররাজ বলিল—তোর প্রবন্ধের উপরে আমার লোভ নাই। লোভ তোর চামড়াখানার উপরে।

এই বলিয়া সে তীক্ষ্ণ খড়্গের আঘাতে গণেশের দেহ চিরিয়া ফেলিয়া তাহার চামড়াখানি খুলিয়া লইয়া বেশ সযত্নে ভাঁজ

করিয়া, ছোট একটি সুটকেশে পূরিয়া, পুনরায় শীতবস্ত্রাদি গায়ে জড়াইয়া হেলিতে দুলিতে প্রস্থান করিল। গণেশের চর্ম্মহীন রক্তাক্ত দেহ টেবিলের উপর পড়িল। খানিকটা রক্ত ছুটিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি ছত্রের নীচে গিয়া পড়িল। সকলে ভাবিল, সম্পাদক ছত্রটিকে লাল কালিতে আণ্ডার-লাইন করিয়া দিয়াছেন। সেই ছত্রটি তুলিয়া দিয়া আমরা গণ্ডার-জীবনকাহিনীর অবসান করিলাম ঃ

"চর্ম্মের দৃঢ়তাতেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব।"

শার্দ্দূলের শিক্ষা

১

সুন্দরবনে রক্তমুখ নামে এক ব্যাঘ্রশাবক বাস করিত। কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে যখন শার্দ্দূল হইয়া উঠিল, তখন মহা বিপদে পড়িল। এত দিন তাহার নিজের আহার সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল না, তাহার মাতা পশু শিকার করিয়া আনিয়া দিত—সে পরমানন্দে নিশ্চিন্ত মনে তাহা ভক্ষণ করিত। কিন্তু এখন সে বয়ঃপ্রাপ্ত, তাহার জননী মৃত, আহারান্বেষণ তাহাকে নিজেকেই করিতে হয়। কিন্তু ওই অন্বেষণ পর্য্যন্তই—সংগ্রহ আর হইয়া ওঠে না। মানুষ ও হরিণ তো দূরের কথা সে একটা ছাগশিশুকেও শিকার করিতে সমর্থ নয়। ব্যাঘ্রের সহজাত কৌশল ও শক্তি দুইয়েরই তাহার অভাব। শিকারের ঘাড়ে অতর্কিতে পড়িবার আগেই সে হয় তো একটা হুঙ্কার করিয়া ওঠে। কিম্বা ঠিক লক্ষ্যের উপরে লাফাইয়া না পড়িয়া দশ হাত এদিক-ওদিক গিয়া পড়ে, শিকার পলাইয়া যায়। আহার আর তাহার জোটে না।

এইরূপে হতাশ হইতে হইতে সে স্থির করিল, দূর ছাই, ইহার চেয়ে নিরামিষ ভোজন ধরিলেই হয়। কিন্তু সুন্দরবনে নিরামিষ আহার্য্য আমিষের চেয়েও দুর্ল্লভ, তাহা কি আগে সে জানিত? ফলে তাহার অধিকাংশ দিনই প্রায়োপবেশনে কাটিতে লাগিল।

:

পাঠক, তুমি হয় তো ভাবিতেছ বাঘের এমন দুর্দ্দশার কারণ কি। কারণ আর কিছুই নয়—বাল্যকালে পিতা-মাতার অনবধানতা বশতঃ সে কুশিক্ষা পাইয়াছিল। বাঘের আবার শিক্ষা কি? আছে বই কি। শৈশবে এক দিন যখন সে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তাহাকে একটি মার্জ্জার-শাবক মনে করিয়া শিয়াল পণ্ডিত নিজের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া লয়। শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় সে কিছুকাল ছাত্র-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। শিয়াল পণ্ডিত পাঠশালায় জন্তু-জানোয়ার-গুলিকে সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা কোন প্রকার শিক্ষাই দিত না, কেবল মাসান্তে নিয়মিত বেতন আদায় করিয়া লইয়াই খুশী থাকিত। বাঘের বাচ্চাটির অভিভাবক না থাকাতে তাহাকে ফ্রি-ষ্টুডেণ্ট হিসাবে ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছিল। পাঠশালায় থাকিয়া রক্তমুখের লাভ হইল এই যে, না পাইল সে কৃষ্টি, আবার ব্যাঘ্র-শাবকগণ ছেলেবেলা হইতে পশু-শিকারের যে কৌশল শিক্ষা করে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল। এই কারণে সে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। একদা শিয়াল পণ্ডিত তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া পাঠশালা হইতে নাম কাটিয়া তাহাকে তাড়াইয়াদিল। তখন হইতেই রক্তমুখের বিপদের সূত্রপাত। শিকারের কৌশল তাহার অজ্ঞাত—অনাহারে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। অন্যান্য বাঘেরা এই অকর্ম্মণ্য পশুটিকে ঘৃণা করিত, কাজেই তাহাদের কাছেও রক্তমুখের আশা করিবার কিছু ছিল না।

এক দিন অনাহারে ও মনঃকষ্টে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গলিতনখ নামে এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ পাইল। তাহাকে সে নিজের

সমস্যা জ্ঞাপন করিয়া তাহার পরামর্শ যাচ্‌ঞা করিল। গলিত-নখ সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া বলিল—বৎস, তোমার সমস্যা অতি জটিল এবং ইহার একমাত্র সমাধান শিকারের কৌশল শিখিয়া লওয়া।

রক্তমুখ বলিল—শিখিবার বয়স গিয়াছে আর শিখিবই বা কোথায়? এ বনে কেহ আমাকে শিখাইতে রাজি নয়।

গলিতনখ বলিল—তাহা আমি জানি। তবে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। তোমাকে হত্যা ও প্রাণি-শিকারের ট্রেনিং স্কুলে কিছু দিন গিয়া শিক্ষানবিশি করিতে হইবে।

ইহা শুনিয়া রক্তমুখ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—প্রভু, নিশ্চয়ই আমি সেখানে যাইব। কোথায় সেই স্কুল?

গলিতনখ বলিল—কলিকাতা সহর।

রক্তমুখ তখনই দীর্ঘ পদক্ষেপে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিল।

গলিতনখ তাহাকে ডাকিয়া বলিল—বৎস, সে বড় কঠিন স্থান। সুন্দরবন তাহার তুলনায় অতিশয় নিরাপদ, একটু সাবধানে চলা ফিরা করিও। মানুষ বলিয়া তাহাদের অবহেলা করিও না, গুরু বলিয়া তাহাদের সমীহ করিও।

রক্তমুখ চলিয়া গেলে গলিতনখ ভাবিতে লাগিল, নির্ব্বোধ জানোয়ারটিকে কলিকাতায় যাইতে বলিয়া কি ভালো করিলাম? বেচারা মারা গেলেও জানিবার উপায় থাকিবে না। কাগজে তো আর বাঘ বলিয়া উল্লিখিত হইবে না—কেবল বাহির হইবে যে সম্প্রদায়বিশেষের অস্ত্রবিশেষে সম্প্রদায়বিশেষের এক জন

নিহত হইয়াছে। তার মধ্যে কোন্‌টা মানুষ আর কোন্‌টা রক্তমুখ কেমন করিয়া বুঝিব ?

রক্তমুখ কলিকাতায় আসিয়া সত্য সত্যই মহা ফাঁপরে পড়িল। তাহার মনে হইল, ইহার চেয়ে সুন্দরবন অনেক নিরাপদ ছিল ; এমন কি, সেখানে অনাহারে মৃত্যুও তাহার একবার শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হইল।

সে দেখিল, সন্ধ্যা হইবা মাত্র শহরের পথ-ঘাট জনশূন্য হইয়া গেল। অন্ধকারে কোথায় যাইবে ভাবিয়া না পাইয়া সে ধর্ম্মতলার মোড়ে একটি গলির মুখে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময়ে দুই জন লোক গলি দিয়া ঢুকিতেছিল, তাহারা অন্ধকারে রক্তমুখকে চিনিতে না পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এক জন শুধাইল—ও কে ? রক্তমুখ সাড়া দিল না। তখন আর এক জন বলিল—বোধ হয়, সংখ্যা-গুরু। সংখ্যা-গুরু যে সম্প্রদায়বিশেষের নাম রক্তমুখ তাহা জানিত না। তাহাকে সংখ্যা-গুরু বলিয়া মনে হইবা মাত্র লোক দুই জন সভয়ে পলায়নে উদ্যত হইল। এমন সময়ে ধাবমান একখানি মোটরের আলো আসিয়া রক্তমুখের গায়ের উপরে পড়িল। লোক দুই জন যুগপৎ বলিয়া উঠিল—না ভাই, ওটা মানুষ নয়, একটা বাঘ মাত্র। তখন তাহারা হাসিতে হাসিতে নির্ভয়ে তাহার পাশ দিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। এ অভিজ্ঞতা রক্তমুখের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। সুন্দরবনে সে দেখিয়াছে মানুষ বাঘকে ভয় করে—এখানে দেখিল মানুষ মানুষকে করে ভয়—বাঘকে সে বিড়ালের মতো নিরীহ মনে করে। লজ্জায়

তাহার মুণ্ড হেঁট হইয়া গেল—এবং জিহ্বা হইতে লালা পড়িয়া মাটি ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

সে বুঝিল, এখানে মানুষের বেশ ধারণ না করিলে শ্রদ্ধা পাইবে না। সে মানুষের পরিচ্ছদের সন্ধানে বাহির হইল। অধিক দূর যাইতে হইল না, এক স্থানে একটি মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া তাহার ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতেই এক দল লোক H. H. রব করিয়া ছোরা ও লাঠি লইয়া তাহাকে তাড়া করিল। রক্তমুখ গত্যন্তর না দেখিয়া পলাইল। আক্রমণকারিগণ তাহাকে ধরিতে না পারিয়া থামিল। রক্তমুখ দূর হইতে শুনিতে পাইল—'ভাই, H, কি শয়তান, বাঘের পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল—ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই।'

কিন্তু রক্তমুখের তখনো শিক্ষা হয় নাই। সে পুনরায় আর একটি মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া ধুতি ও পাঞ্জাবীর উপরে মৃত ব্যক্তির লুঙি ও টুপি পরিয়া ফেলিল। এই অপরূপ বেশে তাহাকে কেমন দেখায়, একখানা আরশি পাইলে মন্দ হইত না, ইত্যাদি কথা যখন সে ভাবিতেছে, ঠিক তখন কয়েক জন লোক M. M. শব্দ করিতে করিতে তাহাকে তাড়া করিল। রক্তমুখ আবার প্রাণভয়ে ছুটিল। এবারে ছুটিতে ছুটিতে সে এক সরাইখানায় গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে এক দল লোক তাহারই মতো লুঙি ও টুপি পরিয়া বসিয়া পানাহার করিতেছিল। রক্তমুখকে তাহারা বাঘ বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া সাদরে তাহাদের পাশে বসিতে দিল এবং তাহার সম্মুখে প্রচুর আহার্য্য

স্থাপন করিল। রক্তমুখ অনেক দিন পরে পেট ভরিয়া খাইল।

আহার শেষ হইলে দলের প্রধান ব্যক্তি প্রত্যেককে একখানা করিয়া ছোরা উপহার দিল। রক্তমুখও একখানা ছোরা পাইল। উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সে কারণ শুধাইল। প্রধান ব্যক্তিটি তাহার মূর্খতায় বিস্মিত হইয়া শুধাইল—'কোথা হইতে আসিতেছ? সুন্দরবন হইতে না কি?'

রক্তমুখ স্বীকার করিল—সত্য সত্যই তাহার বাড়ী সুন্দরবনে।

তখন সেই ব্যক্তি রক্তমুখকে ছোরা চালনার কৌশল ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিল এবং বলিল—H. দেখিলেই মারিবে।

রক্তমুখ শুধাইল—H কি করিবে?

লোকটি বলিল—সুযোগ পাইলে সে-ও তোমাকে মারিবে। তুমি যে M.

রক্তমুখ বলিল—সবই বুঝিলাম, কেবল H ও M বলিতে কি বুঝায় তাহা ছাড়া। H ও M এর অর্থ কি?

ইহা শুনিয়া লোকটি জিভ কাটিয়া বলিল—ও কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আইনে ইহার অধিক বলা নিষেধ। আমরা প্রয়োজন হইলে এবং না হইলেও মানুষের মাথা ভাঙিতে পারি, কিন্তু আইন ভাঙিতে অক্ষম। নবাবের নিষেধ আছে। তখন রক্তমুখ ছোরা লইয়া H নিধন-ব্রতে বাহির হইল।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও নির্বোধ অনিপুণ রক্তমুখ এক জন H.-কেও হত্যা করিতে পারিল না। অথচ H ও M-গণ

কেমন কৌশলে, কেমন অনায়াসে পরস্পরকে হত্যা করিতেছে, তাহা সে চোখের উপরে দেখিতে লাগিল—এবং ক্রমে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও পশুত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা তাহার মনে আশাতীত মাত্রায় বাড়িয়া গেল। সুন্দরবনে সে কৌশলী ব্যাঘ্র-যুবকদের হরিণ, মহিষ, কুম্ভীর এবং মনুষ্য প্রভৃতি শিকার করিতে দেখিয়াছে এবং মনে মনে তাহাদের প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে মানুষের মানুষ শিকার দেখিয়া বুঝিল, পশুরা এ বিষয়ে নিতান্তই নাবালক। একবার তাহার মনে হইল, কয়েক জন মানুষকে সুন্দরবনে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া পশুদের ট্রেনিং-কার্য্যে নিয়োগ করিবে।

রক্তমুখ হত্যার কৌশল অনেকটা বুঝিল, কেবল বুঝিতে পারিল না—ইহার উদ্দেশ্য কি? হরিণ ও বাঘ ভিন্ন শ্রেণীর পশু, কাজেই একে অপরকে হত্যা করে। কিন্তু H ও M আপাতদৃষ্টিতে একই প্রকার পশু বলিয়া তাহার মনে হইল, উভয়েরই হাত-পা দু'খানা করিয়া, চেহারাও এক রকম—তবে এই হিংসা কেন? কিন্তু মানুষের প্রতি তাহার ভক্তি এই কয় দিনে এতই বাড়িয়াছিল যে, এই হত্যাকাণ্ডকে সে অকারণ মনে করিতে পারিল না—বরঞ্চ তাহার মনে হইল, হত্যা-রহস্য বুঝিবার যোগ্যতা এখনো সে লাভ করিতে পারে নাই। একদিন পারিবে, এই আশায় সে শহরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে শহরবাসী শান্তিস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছে। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো—হঠাৎ শান্তিস্থাপন কেন? তবে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব—যুদ্ধই বা বাধিয়াছিল কেন?

দুই-ই সম্পূর্ণ অমূলক। আসল কথা, দুই পক্ষই কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে আর এত দিনের সযত্ন চেষ্টায় তাহারা যে-সব অস্ত্র-শস্ত্র, ছোরা-ছুরি, হাত-বোমা ও পেট্রল সংগ্রহ করিয়াছিল সেগুলি এখন নিঃশেষিত-প্রায়। এবারে কিছু দিন শান্তি না হইলে নূতন সংগ্রহ অসম্ভব। শান্তি যুদ্ধেরই ভূমিকা।

যাই হোক, নাগরিকগণ এক্ষণে লাঠি-শোটা, ছোরা-বন্দুক প্রভৃতি শান্তিস্থাপনের সরঞ্জামে সজ্জিত হইয়া সভাস্থলে সমবেত হইয়া দুই পক্ষ নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া উপবেশন করিয়াছে এবং পরস্পরের দিকে সন্দেহে ও ভয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

শান্তি-প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ, কেবল এক জন যথেষ্ট নিরপেক্ষ চেয়ারম্যানের অভাব। কেহই অপর পক্ষের লোকের দাবী মানিতে প্রস্তুত নয়। ক্রমে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের বিতণ্ডাতে শান্তিভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, এমন সময়ে রক্তমুখ সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিল। সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—M না H ?

রক্তমুখ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া থাকিল।

তখন এক জন তাহার লুঙি ও টুপি দেখিয়া বলিল—M.

অপর আর একজন লুঙি-চাপা ধূতি অবিষ্কার করিয়া বলিল—H.

সকলের মধ্যে বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—ইনি M + H.

তখন সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল—তবে ইনিই আমাদের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান।

রক্তমুখ মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই সকলে তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইয়া সোল্লাসে সগর্জ্জনে শান্তি-সংকীর্ত্তনের

উদ্দেশ্যে পুরী পরিভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। রক্তমুখ যথা-সম্ভব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু বেশীক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। পথের মধ্যে এক জায়-গায় একটি ছাগশিশু দেখিয়া শান্তি-কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া সে এক লাফ মারিল—কিন্তু অল্পের জন্য লক্ষ্যের উপর না পড়িয়া এক মুখ-খোলা manholeএর মধ্যে গিয়া পড়িল এবং জলের তোড়ে ভাসিতে ভাসিতে অল্পকালের মধ্যেই ধাপার মাঠে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া গায়ের পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া এক দৌড়ে সুন্দরবনে গিয়া উপস্থিত হইল।

৩

কলিকাতার শিক্ষার গুণে রক্তমুখ এখন সব চেয়ে প্রবল শার্দ্দূল। অন্যান্য পশু, আগে যাহারা তাহাকে অবজ্ঞা করিত, তাহার ভয়ে এমন জড়-সড়, সকলেই তাহার কাছে হাতজোড় করিয়া অবস্থান করে। রক্তমুখের নামে উক্ত অঞ্চলের পশু-জগৎ প্রকম্পিত। সে এখন সার্থকনামা।

তাহা ছাড়া, কলিকাতার শিক্ষা তাহার সূত্রে সুন্দরবনের পশু-জগতে প্রবেশ করিয়াছে—অন্য নামের অভাবে পশুরা তাহাকে বলে—'মানবিক অত্যাচার'। সুন্দরবনের পশু-সুন্দরীদের মান-ইজ্জৎ লইয়া টেকা ভার।

রক্তমুখ কাহাকেও ভয় করে না কেবল মানুষের নাম শুনিলে এখনো তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে।

পূজার রচনা

পাঠক তুমি যদি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আসিতে রাজি হও, তবে তোমাকে এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইতে পারি। বাঙালী লেখকগণ সম্প্রতি যে-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহাই দেখিতে আমি যাইতেছি, তুমি ইচ্ছা করিলে আমার সঙ্গে আসিতে পারো। যদি জিজ্ঞাসা করো কি সেই দৃশ্য? তবে অন্য নামের অভাবে ইহাকে বাঙলা সাহিত্যের বিশ্বরূপ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। বিশ্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে যদি চাও, তবে আমার সঙ্গে এসো।

কোথায় যাইব? এ আবার কেমন কথা? বাঙালী সাহিত্যিকের বাড়ী খুঁজিয়া পাইতে গবেষণা করিবার প্রয়োজন হয় না। যে কোন বাড়ীতে ঢুকিলেই চলে, বাংলা দেশে সাহিত্যিক নয় কে?

সম্মুখে পূজা। সংবাদপত্র, মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, দৈনিক প্রভৃতি সমস্ত পত্রেরই পূজা-সংখ্যা বাহির হইবে। যে-সব কাগজ দশ বৎসর পূর্ব্বে লোপ পাইয়াছে, তাহারাও কুম্ভকর্ণের মতো এই উপলক্ষে অন্ততঃ একবারের জন্য জাগিয়া উঠিতেছে। এই সব পত্রিকার স্ফীতোদর চাহিদা মিটাইবার জন্য বাঙালী সাহিত্যিকগণ আজ দিনের আহার ও রাত্রির নিদ্রা বিস্মৃত।

গল্প এবং উপন্যাসের দাবীই সবচেয়ে বেশী। হেড়-পীস্ টেল-পীস্ সকলে তৈয়ারী করিতে পারে না, কাজেই নির্দ্দিষ্ট মাপের কবিতারও প্রয়োজন আছে। প্রবন্ধ? অবশ্যই প্রবন্ধেরও একটি চাহিদা আছে—কিন্তু তাহার মধ্যেও একটি নীতি নিহিত। বৈজ্ঞানিক সমস্যার ফ্রেমের মধ্যে রঙীন যৌন-তত্ত্ব ভরিয়া দিয়া এক প্রকার রচনার রেওয়াজ হইয়াছে, গল্প-উপন্যাসের পরেই তাহার দাবী। ইহাতে একই সঙ্গে পাঠকের সংস্কৃতির ক্ষুধা ও বৃহত্তর ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। যে সময়ে গোয়াল ঘরে লুকাইয়া হরিদাসের গুপ্তকথা পড়িতে হইত—সে সময় বহুদিন হইল গত হইয়াছে। ছবি! ছবি, আছে বই কি। ছবি না হইলে কাগজ চলে! দেশী বিদেশী চিত্র তারকাদের ছবির ফাঁকে ফাঁকে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেহরু, বিবেকানন্দের ছবি অবশ্যই মুদ্রিত হইবে। দুধের সহিত জল, না জলের সহিত দুধ, কাহার সাধ্য ধরে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আবশ্যক বিজ্ঞাপনের। তেমন তেমন সচিত্র বিজ্ঞাপন হইলে পাঠককে একই সঙ্গে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, চিত্র সমস্তর স্বাদ দিতে পারে। পাঠককে দেয় 'অহৈতুক আনন্দ'। আর প্রকাশককে দেয়—'হৈতুক আনন্দ'। বিজ্ঞাপনেই সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ঘনীভূত সুধা। বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্যই এই সব গল্প কবিতার প্রয়োজন, তাহার জন্যই এত আয়োজন। পূজা-সংখ্যার আসরে বাংলা সরস্বতী স্বয়ম্বর মাল্য লইয়া অবতীর্ণ হইবেন, নিতান্ত নাবালকেও জানে রাজকুমার বিজ্ঞাপনের কণ্ঠেই সেই মাল্য গিয়া পড়িবে।

কিন্তু এক কথা বলিতে আর এক কথা আসিয়া গেল, বাঙালী সাহিত্যিকের বর্ণনা করিতে বসিয়াছিলাম, বাংলা সরস্বতীর নয়। গল্প উপন্যাসের দাবী মিটাইবার জন্য সমস্ত বাঙলা সাহিত্যিক আজ বিব্রত। কেহ অনেক্‌গুলি ছোট গল্প জোড়া দিয়া একটি উপন্যাস রচনা করিতেছে, রুমাল জুড়িয়া জুড়িয়া ধুতি তৈয়ার করিবার মতো, কেহ একখানি উপন্যাসকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া অনেকগুলি ছোট গল্প ফাঁদিয়া বসিতেছে, অখণ্ড ভারতবর্ষকে খণ্ডন করিয়া বিভিন্ন 'স্থান' রচনার মতো; আবার কেহ কেহ বা প্রবন্ধের সহিত প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া তাহাতে গল্পের সরসতা দিতে চেষ্টা করিতেছে—সকলেরই হাতের কাছে অখ্যাতনামা ইংরাজি গল্পের পুস্তক।

কাহারো বা গৃহিণী বলিতেছে, ওগো বেলা হ'ল, বাজারে যাও। বেচারা লেখকের হুঁস নেই। কাহারো ছেলে বা পাঠ লইতে আসিয়া চড় খাইল। আর যাহার পাওনাদার পূজার লেখার আশায় আছে সে একবার জানালা দিয়া নীরবে উঁকি মারিয়া লেখকের অধ্যবসায় দেখিয়া আশ্বস্তচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল। ফলকথা, প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্যিকের বাড়ী আজ একটি ছোটখাটো কারখানায় পরিণত। গল্প, উপন্যাস, উপন্যাস, গল্প। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই। কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাঙালী সাহিত্যিকদের কলম ছুটিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু এমন নির্গুণ বর্ণনায় গল্প জমে না। কাজেই চলো, পাঠক, কোন বিশেষ একজন সাহিত্যিকের বাড়ীতে গিয়া

ঢুকি, সেখানে শিক্ষা ও কৌতুক নিশ্চয় এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত।
এসো, আমরা প্রখ্যাত কবি নিবারণ কুণ্ডুর বাড়ীতে যাই।
নিবারণ বাবু আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি। ফ্রান্সে লে
নেব্রাঁ, মস্কোতে নেভারস্কী এবং জার্ম্মাণীতে ফন কুণ্ডু নামে
তিনি পরিচিত। দেশের লোকে তাঁহার কবিতা বুঝিতে
পারে না কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার বাঙলা ভাষা
বিদেশীরা দিব্য বুঝিতে পারে এবং ডবল বিস্ময় এই যে, একই
ভাষা ইংরাজ, চীনা, রাশিয়ান, জার্ম্মাণ, ফরাসী সবাই বোঝে
—যদিচ তাহারা কেহই পরস্পরের কথা বুঝিতে সমর্থ নয়।
ইহার একমাত্র কারণ নিবারণ মানব জাতির আদিম ভাষা
হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাষায় লিখিয়া থাকেন; কিন্তু এমন বরাবর
ছিল না। এক সময়ে তিনি তোমার, আমার এবং রবীন্দ্রনাথ-
বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই লিখিতেন। সে বহুকাল আগের কথা।
তখন তাঁহার প্রথম যৌবন, তিনি আর দশজন বেকার বাঙালী
যুবকের মতো ভুলছন্দে প্রেমের কবিতা লিখিতেন। কিন্তু
হঠাৎ একদিন ক্রিকেটের একটি বল তাঁহার মাথায় আসিয়া দারুণ
আঘাত করে। তিনি ছয় মাস অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া
থাকেন। যেদিন তাঁহার প্রথম জ্ঞান হইল তিনি মানব হৃদয়ের
'এসপেরাণ্টোতে' কথা বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার মা কাঁদিয়া
উঠিয়া বলিলেন—বাছা পাগল হইয়াছে। কেহই যখন তাঁহার
ভাষা বুঝিতে পারিল না, যখন তাঁহাকে পাগলা গারদে পাঠান
স্থির হইয়াছে এমন সময়ে একজন রাশিয়ান তাঁহার কথা
বুঝিতে পারিল। নিবারণ বাবুর আত্মীয়-স্বজন বলিল—পাগল

হওয়ার চেয়ে যে কোন দেশের ভাষা বলা ভালো। আহা, কে সেই ক্রিকেট বল ছুঁড়িয়াছিল, ব্যাধের নিক্ষিপ্ত সেই বাণের মতো, যাহা নিবারণচন্দ্রের হৃদয় হইতে বিশ্ব ভাষার বন্দিনী স্রোতস্বিনীকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। মোটের উপর তাঁহার কবিতা বিদেশীরা বোঝে—স্বদেশীরা বুঝিতে পারে না। দু'-ঠ্যাং-ওয়ালার মুল্লুকে এক-ঠ্যাংওয়ালা আসিলে তাহার যেমন এক প্রকার আদর হয়, তেমনি আদর তাঁহার কবিতার বাংলা দেশের মাসিক পত্রিকাদিতে।

কিন্তু নিবারণ বাবুকে আমরা দোষ দিই না—যেহেতু তিনি এখন সাধারণের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখেন না। সেই ক্রিকেট বলের আঘাতে তাঁহার মস্তিষ্কে বা স্নায়ুতন্ত্রে কোথায় কি একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে যাহার ফলে জগৎটা তাঁহার চোখে একখানা সরা পিঠের মতো প্রতিভাত হয়। তাঁহার নূতন জগৎ দুই 'ডায়মেনশনের'। তাহার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, কিন্তু গভীরতা নাই, ফলে মানুষগুলা তাঁহার কাছে শুক্না লঙ্কার মতো চ্যাপ্টা মনে হয়। তিনি বসিয়া বসিয়া দেখেন জগৎটা যেন ছবির জগৎ—ভাস্কর্য্যের জগৎ নয়। তাই এই ছবির জগতের বিশ্বযুদ্ধ দেখিয়া তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

"ছবিতে ছবিতে লড়াই চলেছে
হনলুলু হ'তে হাইফা
ছবির বাসন ঝন্ ঝনাৎ
বুকের ভিতর চন্ চনাৎ

কলের ধোঁয়ায় সিগারেট ফোঁকে

ভগবান আর Viper"।

নিবারণ বাবুর কবিতার টেক্‌নিক বড়ই বিচিত্র। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ আছে, প্রত্যেকটি লাইনেরও অর্থ আছে—কিন্তু সবশুদ্ধ মিলিলেই কেমন তাল গোল পাকাইয়া যায়! মোটামুটি ইহাই নিবারণ বাবুর পরিচয়।

গিরীশ বাবু পূজা-সংখ্যা বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। পাড়ার একটি সাহিত্যিক তাঁহার সাহায্যকারী। তাহার সঙ্গে গিরীশ বাবুর চুক্তি এই যে, সে লেখা সংগ্রহ করিয়া আনিবে তৎপরিবর্ত্তে গিরীশ বাবু তাহার লেখা ছাপিবেন। সাহিত্যিকটির নাম অজয়।

অজয় নিবারণ বাবুর নাম জানিত। কে না জানে? তিনি বিশ্বভাষায় লেখা সত্ত্বেও বাঙালী পাঠক তাঁহার নাম জানে —বাংলা দেশ যে বিশ্বের অন্তর্গত, অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে ইহাও তাহার আর একটি প্রমাণ।

অজয় নিবারণ বাবুর ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—পূজা-সংখ্যা? কি চাই? কবিতা? পঞ্চাশ টাকা। না, না, কিছুতেই তার কমে হবে না। আমেরিকা থেকে দেয় পাঁচশো ডলার। দেশের লোকের জন্য পঞ্চাশ টাকা। এটা কন্‌সেশন!

মাত্র পঞ্চাশ টাকাতে বিশ্বভাষায় লিখিত একটি কবিতা পাওয়া যাইবে শুনিয়া অজয় কৃতার্থ হইয়া হাসিল।

আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া নিবারণ বাবু একটি

রেফ্রিজারেটার খুলিয়া ফেলিলেন—এবং একটি কবিতা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন।

রেফ্রিজারেটারের মধ্যে কবিতা ? অজয়ের বিস্ময় দেখিয়া নিবারণ বাবু ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—আমার কবিতায় ইউরোপীয়ান atmosphere তাই তাকে ইউরোপীয়ান temperature-এ রাখতে হয়। নতুবা নষ্ট হবার আশঙ্কা। যেমন পেনিসিলিন্। শীঘ্রই আমার 'পেনিসিলিন্ এণ্ড পোয়েট্রি' নামে গ্রন্থ বেরুচ্ছে। হ্যাঁ—পঞ্চাশ টাকা।

শেষোক্ত কথায় অজয়ের হুঁস ফিরিয়া আসিল। সে টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াই কবিতাটি লইয়া দৌড় মারিল—পাছে টাকার অঙ্ক আবার বাড়িয়া যায়।

গিরীশ বাবু সমস্ত শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন—পঞ্চাশ টাকা ! যাও, এখনি ফেরৎ দিয়ে এসো ! এই বাজারেও একটা 'হেড-পীস' ওর চেয়ে অনেক কমে হয় তবে তাই বা ছাপবো না কেন ? না বাপু, একটা কবিতার জন্য আমি পঞ্চাশ টাকা দিতে পারব না।

অগত্যা অজয় পুনরায় নিবারণ বাবুর গৃহে গিয়া প্রবেশ করিল। নিবারণ বাবু তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠ্লেন—কি ? ফেরৎ এনেছো ? অত দিতে পারবে না ? (নিবারণ বাবুর এরকম অভিজ্ঞতা নূতন নয় মনে হইতেছে) তা কত দেবে ? না, না, আমি একেবারে ফেরৎ নেবো না, ও কবিতা যে বাগদত্তা।

নিবারণ বাবুর সর্ব্বজ্ঞতার ফলে অজয়ের কাজ সহজ হইয়া

গিয়াছিল। সে বলিল—আজ্ঞে মালিক যে রাজি হন না।

নিবারণ বাবু বলিলেন দশ টাকা? পাঁচ টাকা? পাঁচ সিকে? কিছুই নয়?

অজয় বলিল আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।

নিবারণ বাবু বলিলেন—কিন্তু বাগ্‌দত্তাকে ফেরৎ নিই কেমন করে? তপোবন থেকে শকুন্তলা বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে এসেছিল? বিশেষ, রেফ্রিজারেটারের বাইরে থাকাতে কবিতায় যে বীজাণু প্রবেশ করেছে। আচ্ছা, তোমার নিজের কাছেও কি কিছু নেই? এই বলিয়া তিনি তাহার পকেটের ভিতর তাকাইলেন।

ওই তো এক বাক্স সীজারস্ দেখা যাচ্ছে, দাও, ওটাই দাওনা কেন।

অজয় একটা কূল পাইল। সে সীজারসের বাক্সটি নিবারণ বাবুর হাতে তুলিয়া দিয়া কবিতাটি লইয়া প্রস্থান করিল।

নিবারণ বাবু বাক্সটি খুলিয়া দেখিলেন—শূন্য। তাহাতেও তিনি দমিলেন না, ভাবিলেন কিছুই নিরর্থক নয়, সব কিছুরই সার্থকতা আছে, যাক্ মন্টি খেল্‌বে।

মন্টি তাঁহার পুত্র। জেনারেল মণ্টোগোমারি যখন টিউনিশিয়ায় জিতিতেছেন—তখন ইহার জন্ম, তারই চিহ্ন ওই নামটি।

পাঠক, পূজা-সংখ্যায় নিবারণ বাবুর কবিতা নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। বুঝিতে অবশ্যই পারিবে না, সে চেষ্টাও করিও না। যদি রস গ্রহণ করিতে না পারো অজয়ের সীজারসের বাক্স ও মন্টির খেলার কথা স্মরণ করিও, কোনও এক রকম রস পাইবেই পাইবে।

প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ

নিমন্ত্রিত অতিথিগণের আহারাদি শেষ হইলে সিন্ধবাদ তাঁহার দশম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—মহোদয়গণ, এবার সমুদ্রযাত্রা করিয়া অল্প-দিনের মধ্যেই আমি লবঙ্গ দেশে গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানকার জাহাজঘাটায় আমাদের জাহাজগুলি নোঙ্গর করিয়া তীরে উপস্থিত হইলাম। এই দেশে ইতিপূর্ব্বে আমি যাই নাই, কিম্বা গিয়াছে এমন কাহারো মুখে এদেশের কথা শুনি নাই। কাজেই এদেশের সবই আমার কাছে নূতন লাগিল। তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। সমুদ্রতীরে যে-সহরে আমাদের জাহাজ লাগিল, সেখানকার পথঘাট প্রায় নির্জ্জন! আমাদের খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রয়োজন ছিল—অথচ কাছাকাছি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। যখন কি করিব ভাবিতেছি এমন সময়ে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, মহাশয় আমরা বিদেশী, সবেমাত্র পৌঁছিয়াছি, কিছু খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, কোথায় পাইব। ভদ্রলোকটি বলিলেন, এখন খাদ্য পাইবার আশা নাই, দেখিতেছেন না দোকানপাট সব বন্ধ, পথ-ঘাট সব নির্জ্জন, আর একটু পরেই কোটালের বন্দুক চলিতে আরম্ভ করিবে।

আমি বলিলাম, সে আবার কি? তিনি বলিলেন, সে অনেক কথা, এখানে দাঁড়াইয়া বলিতে গেলে দুইজনকেই

বন্দুকের গুলীতে মরিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে আজ আমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন, তখন সব শুনিবেন।

সিন্ধবাদ বলিলেন, কৌতূহলবৃত্তি আমার মনে চিরকাল প্রবল, এবং তজ্জন্য অনেক বিপদে আমাকে পড়িতে হইয়াছে। আমি সে দেশের কাহিনী শুনিবার জন্য ভদ্রলোকের গৃহে যাইতে সম্মত হইলাম। জাহাজের মাঝিমাল্লাদের সে রাত্রির মতো কোনমতে চালাইয়া লইতে বলিয়া আমি লোকটির সঙ্গে রওনা হইলাম। সহরটি বড়ই, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলাম সত্যই সব দোকানপাট বন্ধ, এবং পথঘাট জনবিরল হইয়া আসিয়াছে। তখনো দু'চার জন লোক পথে ছিল তাহারা শঙ্কিতচিত্তে, দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম বহু দগ্ধাবশেষ অট্টালিকা দণ্ডায়মান, বহুতর দোকানপাটের দরজা ভাঙা, ভিতরে কিছুই নাই আর পথ পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাস্তূপে পরিপূর্ণ।

আমি শুধাইলাম পথে এত আবর্জ্জনা কেন?

আমার নিমন্ত্রণকর্ত্তা বলিলেন—যাহাকে আবর্জ্জনা মনে করিতেছেন তাহা মৃতদেহের স্তূপ। তখন ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখি সত্যি সত্যই মৃত নর-নারী বালক-বালিকার স্তূপীকৃত দেহে পথ-ঘাট আচ্ছন্ন। ভাবিলাম, একি! কোথায় আসিলাম? একটু একটু ভয়ও করিতে লাগিল। এমন সময়ে পথের এক দিকে গর্জ্জন উঠিল—জয় খণ্ড মাতাকী জয়! তাহার প্রত্যুত্তরে পথের অপর দিক হইতে গর্জ্জন উঠিল—জয় অখণ্ড মাতাকী জয়! এবং তার পরেই তুমুলরবে

শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঝাঝর বাজিয়া উঠিল—তখন সে এক বিষম হুলহুলা উপস্থিত হইল।

সেই শব্দে ভীত হইয়া ভদ্রলোকটি ছুটিতে সুরু করিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আমরা দুই-জনেই হাঁপাইতেছিলাম। কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া আমি এই সব ব্যাপারের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আগে আহার সমাধা করুন, তার পরে সব হইবে। আহারাদি শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট বসিলে ভদ্রলোকটি বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভদ্রলোকটির নাম নাদুস দাদা। এখন হইতে নাদুস দাদা বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করিব।

নাদুস দাদা বলিতে লাগিলেন—আমাদের এই সহরে কয়েক দিন হইল বিষম দাঙ্গা চলিতেছে। পাঁচ হাজারের উপর লোক নিহত, বিশ হাজার আহত, আর লুণ্ঠন ও ধ্বংসের পরিমাণ কোটি কোটি মুদ্রা হইবে। আজ রাত্রেই একটা বিরাট রকমের মারামারি হইবার আশঙ্কা আছে।

আমি শুধাইলাম—এ সবের কারণ জানিতে পারি কি?

তিনি বলিলেন, সবই আপনাকে বলিব। আমাদের মাতাকে একজন শ্বেতদস্যু দীর্ঘকাল বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছে। তাঁহার সন্তানগণ এখন দুই ভাগে বিভক্ত। একদল বলিতেছে যে, তাহারা মাতার ন্যায্য অংশ আধাআধি ভাগ করিয়া লইবে। অপর দল বলিতেছে সে কি কথা? তাহাতে যে মাতার মৃত্যু ঘটিবে। ইহাতে সেই

পূর্ব্বোক্ত দল বলিতেছে মরিলে আর কি করিব? তাই বলিয়া ন্যায্য ভাগ ছাড়িব কেন? আমরা অর্থাৎ যাহারা অখণ্ড মাতাকে চাহি, এমন সর্ব্বনাশা পন্থায় রাজি হইতে পারি না। এই সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া মাতার সন্তানগণ দুই দলে বিভক্ত—একদল চাহে খণ্ড মাতা, অপর দল চাহে অখণ্ড মাতা। খণ্ড মাতার দলে এবং অখণ্ড মাতার দলে আজ কয়েকদিন হইতে হানাহানি চলিতেছে—সহরের যে দুরবস্থা দেখিলেন এই দাঙ্গাই তাহার একমাত্র কারণ।

এমন সময়ে অদূরে গর্জ্জন উঠিল—খণ্ড্ মাতাকী জয়—এবং পর মুহূর্ত্তেই তাহার প্রত্যুত্তরে রব উঠিল—অখণ্ড্ মাতাকী জয়। নাদুস দাদা বলিলেন—ওই শুনুন দুইজনে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে—মারামারি বাধিবার ইহা সূত্রপাত। এখন সকলের মনের অবস্থা এমন ভীতিজনক হইয়াছে যে কোন মুহূর্ত্তে, যে কোন কারণে একটা বিষম গোল বাধিয়া যাইতে পারে। তবে আপনার কোন ভয় নাই, আপনি আমাদের মাতার সন্তান নহেন, বিদেশী, আপনাকে কেহ কিছু বলিবে না। আপনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। আমাদের ঘুমাইবার উপায় নাই, সারা রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে হইবে। এই বলিয়া নাদুস দাদা বিদায় হইলেন, আমি বিছানায় শুইয়া সদ্যশ্রুত অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির কাহিনী স্মরণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না, আসিবে কেমন করিয়া? ঘন ঘন জয় খণ্ড্ মাতাকী জয়, আর অখণ্ড মাতাকী জয়! ঘন ঘন শঙ্খ-কাঁসর! ঘন পথের পাথরে লাঠি ঠুকিবার শব্দ! মাঝে মাঝে জানালা দিয়া আলোর হলকা প্রবেশ করে, বুঝিতে পারি—

অদূরে একদল মাতৃভক্ত অপর দলের গৃহে আগুন দিয়াছে! ক্ষণে ক্ষণে শুনিতে পাই—'ওই আসিল, ওই আসিল' কিম্বা—'আসিতেছে, আসিয়া পড়িয়াছে,' অথবা 'কুমার পাড়ায় ঢুকিয়াছে, চলো, চলো'। আবার কিছুক্ষণ পরেই বলিয়া ওঠে, 'না, না, কেহ নয়, ভুল হইয়াছে' কখনো বা রব ওঠে—'সব প্রস্তুত তো?' অমনি একবাক্যে সকলে হাঁকিয়া ওঠে—'জয় অখণ্ড মাতাকী জয়'! ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না সামান্য একটি স্ফুলিঙ্গে সমস্ত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। আর ইহাদের যেমন মনের অবস্থা জোনাকীর আলোককে স্ফুলিঙ্গ বলিয়া মনে করিতে ইহাদের বাধিবে না। ভাবিতে লাগিলাম—অপূর্ব্ব এই লবঙ্গ দেশ। কেবল ভয় হইল জনশ্রুতি আকারেও এদেশের কথা অন্যদেশে পৌঁছিলে—তাহার না আজি কি দুরবস্থা হইবে।

কিন্তু একটা বিড়াল কেন? ঘরের মধ্যে একটা বড় আলমারি ছিল তাহার মাথায় একটা বিড়াল আসিয়া বসিয়াছে। আমি তাহাকে তাড়া দিতেই সে একলাফ মারিল, এবং পাশের অপর একটি আলমারির উপরে গিয়া পড়িল। সেই আলমারির মাথায় পানের বাটা ও অন্যান্য কাঁসার বাসন ছিল। সেগুলি ঝন ঝন ঝনাৎ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল—নীচে পিকদানি ও জলপাত্র ছিল—দুই সেট বাসনের সঙ্ঘর্ষে শব্দ আরও বিকট হইল—আর সেই নিস্তব্ধ রাত্রির পটভূমিতে এই সম্মিলিত শব্দ বিকটতর প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। অমনি রব উঠিল—'আসিয়াছে; আসিয়াছে, শঙ্খ বাজিল, কাঁসর বাজিল, ঢাক বাজিল, ঢোল

বাজিল, 'অগ্রসর হও'—'জয় অখণ্ড মাতাকী জয়'! কেমন করিয়া কি হইল ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য যখন উঠিয়া বসিয়াছি দেখিলাম পাড়া শূন্য—সবাই লাঠি সোটা, কাটারি হস্তে খণ্ড মাতার পাড়ার দিকে ছুটিয়াছে।

তারপরে সে এক বিষম কাণ্ড! অখণ্ড মাতার দল অগ্রসর হইতেই খণ্ড মাতার দল ভাবিল তাহারা আক্রান্ত হইয়াছে—তাহারাও যথোপযুক্ত উপকরণাদি সহ অগ্রসর হইল—তখন দুইদলে ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া গেল।

এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত হইল। ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করিয়া শুনিলাম যে, প্রায় দশ হাজার খণ্ডমাতা আসিয়া অখণ্ড মাতার পাড়া আক্রমণ করিয়াছিল; তাহারা উচিত শিক্ষা পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কেবল হতাহতগণ ফিরিতে পারে নাই। রণক্লান্ত নাগরিক সৈন্যগণের মুখে সে কী জিগীষাজাত তৃপ্তি।

এমন সময়ে প্রাভাতিক সংবাদপত্র আসিয়া পৌঁছিল। অখণ্ড মাতার দলের প্রধান সংবাদপত্র লিখিতেছে—'গতকল্য রাত্রে প্রায় বিশ সহস্র দুর্ব্বৃত্ত খণ্ডমাতা এই পুণ্যপল্লী আক্রমণ করিয়াছিল—তন্মধ্যে দশ সহস্র নিহত পঞ্চদশ সহস্র আহত হইয়াছে, সামান্য কয়েকজন কোন মতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।' সবই বুঝিলাম, কেবল বুঝিলাম না বিশ সহস্র আততায়ীর মধ্যে পঞ্চবিংশ সহস্র হতাহত হয় কেমন করিয়া আর 'সামান্য কয়েকজনই' বা কোথা হইতে আসে? ভাবিলাম লবঙ্গ দেশের সমস্ত ব্যাপারের মতো এখানকার গণিতও স্বতন্ত্র নিয়মে গঠিত।

এমন সময়ে একখানা খণ্ডমাতার দলের সংবাদপত্র হাতে পড়িল। (আগে একদল অপর দলের কাগজ পড়িত না, এখন পড়ে। বিচ্ছেদের সূত্রেই যে মিলন আসে—ইহা কি তাহারই প্রমাণ!) খণ্ডমাতার সংবাদপত্র লিখিতেছে—'গতকল্য প্রায় চল্লিশ হাজার তুছমন (অর্থবোধ হইল না) পাড়া আক্রমণ করিয়াছিল—ভগবানের দোয়ায় (তবে ইহারা ভগবানও মানে দেখিতেছি!) একজনও ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। সমস্ত ব্যাপার চোখে দেখিয়া এবং সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ পড়িয়া আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন তাল গোল পাকাইয়া গেল। একবার আবার মনে হইল গত রাত্রের আক্রমণের ব্যাপারটাই সন্দেহজনক—মূলে আছে সেই আলমারির মাথার উপরের মার্জ্জার। বিড়ালটার বাসন-কোসন ফেলিয়া দিবার শব্দেই লোকের শঙ্কিত মন আক্রমণ কল্পনা করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—আর দুই বিপক্ষ দল লাঠি হাতে অগ্রসর হইলে যাহা হয়—ফলে তাহাই হইয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি আমার এই সংশয়ের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার সাহস হইল না। যাহাদের পক্ষে বিশ হাজারের মধ্যে পঁচিশ হাজার হতাহত করা সম্ভব—সামান্য একজন বিদেশীকে মারিয়া ফেলিতে তাহাদের কতক্ষণ!

কিন্তু একটি কৌতূহল নিবৃত্ত না করিয়া দেশে ফিরিব না স্থির করিলাম। যে-মাতার এমন সব ভক্তপুত্র তাহাকে তো দেখা চাই-ই। এমন সময়ে নাতুস দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আমার মনের ইচ্ছা জানাইলাম। তিনি বলিলেন—ইহা আর শক্ত কি? চলুন মাতাকে দেখিয়া আসি। তখন

খণ্ডাখণ্ড মাতাকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে দুইজনে রওনা হইলাম।

প্রায়ান্ধকার একটি প্রকোষ্ঠে একটি অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা নারী উপবিষ্টা। তাহার পরণে জীর্ণ-চীর, হাতে-পায়ে শৃঙ্খলের দাগ, তাহার চক্ষু নিমীলিত। নাদুস দাদা বলিলেন—ইনিই আমাদের জননী। বহুকাল শ্বেত দস্যুর হস্তে বন্দিনী থাকিয়া ইনি সদ্য মুক্তিপ্রাপ্তা।

আমি শুধাইলাম—ইনি নড়িতেছেন না কেন ?

নাদুস দাদা বলিলেন—বহুকাল শৃঙ্খলিত থাকিয়া নড়িবার অভ্যাস এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এখনো বিশ্বাস করিতেছেন না যে, তাঁহার শিকল খুলিয়াছে—তাই হাত পা নাড়িতে সাহস করিতেছেন না। তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন যে—খণ্ডমাতার দল ইঁহাকে কাটিয়া নিজেদের ভাগ স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়। সেইজন্যই আজ কয়েকদিন হইল দুইদলে বিষম দাঙ্গা চলিতেছে।

আমি অবাক হইয়া নারীকে দেখিতেছিলাম এবং তাঁহার মাতৃভক্ত সন্তানদের কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে একদল যুবক-যুবতী 'শান্তি চাই, স্বাধীনতা চাই, রেজকি চাই' ধ্বনি করিতে করিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তাহাদের পোষাক লাল, মাথার চুল লাল, চোখ দু'টা লাল, কথাবার্ত্তাও রক্তাভ, হাতে তাহাদের একটা শিকল। আমি নাদুস দাদাকে শুধাইলাম ইহারা কে ?

নাদুস দাদা বলিলেন—এই নূতন এক আপদ দেখা দিয়াছে। ইহারা মাতাকে নূতন এক শিকলে বাঁধিতে চাহে।

আমি বলিলাম—ইহাদের বাধা দিবার কি উপায় নাই ?

—এই দেখুন না, বলিয়া তিনি তাহাদের হাতে এক প্যাকেট সিগারেট দিলেন। অমনি তাহারা খুশী হইয়া শান্তি, স্বাধীনতা ও রেজকির দাবী করিতে করিতে ধ্বনি তুলিয়া ফিরিয়া গেল।

আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। মৃত ও ধ্বংসস্তূপে পূর্ণ সহরের পথ দিয়া চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলাম—ইহাদের মিলনের উপায় কি ? ইহারা দুই পক্ষ মিলিত হইয়া জননীর সেবা কি করিতে পারে না ? ইহারা কি চিরকালই এমনি কাটাকাটি করিয়া মরিবে ? কখনোই, কোনো উপলক্ষ্যেই কি মিলিত হইতে পারিবে না ?

এমন সময়ে চোখে পড়িল পথের পাশে একটি স্থানে নীল পোষাকধারী খণ্ড মাতার সন্তান ও গেরুয়া পোষাকধারী অখণ্ড মাতার সন্তান গঙ্গা যমুনার যুগল স্রোতের মতো পাশাপাশি গিয়া মিশিয়াছে। কি আশ্চর্য্য ! সে চীৎকার নাই, দাঙ্গা নাই, মারামারি কাটাকাটি কিছুই নাই। দিব্য শান্তশিষ্ট ভাবে তাহারা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

সার্ব্বজনীন দাঙ্গা ভুলিয়া একী তাহাদের সৌম্য শান্ত ভ্রাতৃ-বৎসল মূর্ত্তি ; এ কোন্ স্থান ? এ অট্টালিকা কি মন্দির ? না গ্রন্থালয় ? তাড়াতাড়ি কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য তাকাইয়া দেখিলাম লোহার গরাদে দেওয়া দরজার উপরে লেখা আছে—'এখানে বিশুদ্ধ গাঁজা বিক্রয় হইয়া থাকে।' তবে গাঁজার প্রভাবেই ইহারা দ্বন্দ্ব ভুলিয়াছে—তবু লোকে গাঁজাকে অবজ্ঞা

করে। গাঁজাই হোক আর যাই হোক—তবু যে ইহাদের একটা মিলনের উপলক্ষ্য আছে জানিয়া মনে সান্ত্বনা পাইলাম।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সিন্ধবাদ থামিলেন। তাঁহার বিস্মিত শ্রোতাদের মুখ দিয়া সমস্বরে ধ্বনিত হইল—'মার হাব্বা, মার হাব্বা—ধন্য এই লবঙ্গ দেশ!'

শৃগালের মনুষ্যত্ব বর্জ্জন

এক জনপদের নিকটে এক অরণ্য ছিল। সেই অরণ্যে একদল শৃগাল বাস করিত। বলা বাহুল্য, সেই বনে আরও অনেক জাতির পশু ছিল, কিন্তু শৃগাল সম্প্রদায়ই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মস্তক গণনা আর মস্তিষ্ক গণনা দুইটি ভিন্ন পদ্ধতি। হালে মস্তক গণনাতেই সকলের অধিকতর আস্থা। যেমন করিয়াই হোক সংখ্যাগরীয়ান না হইতে পারিলে জীবনটাই বৃথা। আমরা সংখ্যালঘু হইয়া জন্মিয়াছি, তাই সংখ্যাগুরু শৃগালের কাহিনী লিখিয়া দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে সঙ্কল্প করিয়াছি।

এই শৃগাল দলের অধিপতির নাম ছিল দধিকর্ণ। মানব সমাজের মতো শিবাসমাজেও নিন্দুকের অভাব নাই। তাহারা বলিত উক্ত শৃগালটি একদিন লোকালয়ে দধি খাইতে গিয়া ভাণ্ডের কানা গলায় বাধাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই হইতে তাহার নাম হইয়াছে দধিকর্ণ। কিন্তু দধিকর্ণের অমাত্যগণ এ কথা স্বীকার করিত না, তাহারা বলিত হুজুরের কান দুইটি দধির মতো সাদা। নিন্দুকেরা বলিত তোমাদের রাজার কান তো একটিও নাই, দুটিই কাটা গিয়াছে। অমাত্যেরা বলিত— থাকিলে দেখিতে পাইতে শাকালুর মতো কেমন শুভ্র রং। কান কাটা গিয়াছে ইহাতে আর যাহাই প্রমাণ হোক তাহাদের রং যে শাদা ছিল না, প্রমাণ হয় না।

দধিকর্ণের কানের ইতিহাস যাহাই হোক সে খুব সাহসী ছিল, বস্তুতঃ অতি সাহসের ফলেই তাহার কান ছুটি গিয়াছিল। সে একাকী গভীর রাত্রে জনপদে গিয়া প্রবেশ করিত এবং ক্ষেতের বেগুন, ইক্ষু, ফুটি, তরমুজ হইতে আরম্ভ করিয়া তৈজস-পত্র যাহা পাইত চুরি করিয়া আনিত। প্রভাতে অন্যান্য শৃগালেরা বলাবলি করিত, মহারাজ কত বস্তু দিগ্বিজয় করিয়া আনিয়াছেন। রাজার চুরিকে দিগ্বিজয় বলে।

এক রাত্রে শিবারাজ দধিকর্ণ কোনো কৃষকের ক্ষেতে ফুটি দিগ্বিজয় করিতে গেলে উক্ত নরাধম একখানা বল্লম ছুঁড়িয়া মারিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বল্লমখানা দধিকর্ণের পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া একটি সুদীর্ঘ রেফের মতো আকাশে উদ্যত হইয়া রহিল। ক্লিষ্ট দধিকর্ণ কষ্টে বনে ফিরিয়া আসিল। বল্লম তাহার পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইয়াই ছিল। পরদিন প্রভাতে দধিকর্ণ প্রজাদের ডাকিয়া বলিল—এই দেখো তোমাদের জন্য কি বস্তু এবার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। সকলেই রাজার প্রজাস্নেহে বিস্মিত হইল। রাজবৈদ্য আসিয়া অনেক টানাটানি করিয়া বল্লমটি পৃষ্ঠচ্যুত করিল। ক্ষতস্থান হইতে অনেকটা রক্ত পড়িল। সকলে বলিল—আহা রাজরক্ত পাত হইল।

দধিকর্ণ বলিল—রাজরক্ত পাতই বর্ত্তমান ইতিহাসের লক্ষণ। এরকম ক্ষেত্রে প্রজারা রাজরক্ত পাত করিবে তাহার চেয়ে রাজার নিজে করাই কি বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়! সকলে রাজকীয় বুদ্ধির দৌড়ে অবাক হইয়া গেল।

তখন সকলে শুধাইল মহারাজ এ বস্তুটি অতি উত্তম, কিন্তু ইহার নাম কি ?

দধিকর্ণ বল্লমের নাম কেমন করিয়া জানিবে ? কিন্তু চুপ করিয়াও তো থাকা যায় না। তাহার মনে পড়িল কৃষকের নিক্ষিপ্ত বল্লম তাহার পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইলে অপর একজন কৃষক তাহাকে বাহবা দিয়া বলিয়াছিল—হাঁ মানুষের মতো মানুষ বটে ! সেই শব্দটাই কিঞ্চিৎ বিকৃতভাবে তাহার মনে ছিল, সে বলিল—ইহার নাম মনুষ্যত্ব ! তারপরে ব্যাখা করিয়া বলিল, মনুষ্যত্ব মানে মানুষের গুণ ! দেখো তোমাদের জন্য কি দুর্লভ বস্তুই না আমি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি !

তখন সকলে একযোগে বলিল—বাহবা ! বাহবা ! দূর হইতে শ্রুত হইল ক্যাহুয়া ! ক্যাহুয়া !

তখন দধিকর্ণের রাজ্যে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, সকলকেই মনুষ্যত্ব সংগ্রহ করিতে হইবে। চিরকাল শিয়াল হইয়া থাকিয়া কি লাভ ? মানুষ হইতে না পারিলে কি সুখ ? তপস্যার বলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিলে শৃগালই বা মানুষ হইতে পারিবে না কেন ? তখন শিবাকুল রাজাদর্শে উদ্বোধিত হইয়া জনপদ হইতে মনুষ্যত্ব সংগ্রহ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল এবং অত্যল্প কালের মধ্যে পুরানো বল্লম, ভাঙা বন্দুক, মর্চেধরা তলোয়ার, প্রভৃতি নানাশ্রেণীর মনুষ্যত্ব সংগ্রহ করিয়া রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে স্তূপাকার করিয়া ফেলিল।

এদিকে জনপদের লোকে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, তাহাদের ক্ষেতের শস্য ও ফলমূল আর খোয়া যায় না বটে কিন্তু পরিত্যক্ত

জীর্ণ অস্ত্রশস্ত্র রাতারাতি কোথায় যেন অন্তর্হিত হইতেছে। তাহারা বুঝিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ইহা এক নূতন চাল। তাই সকলে মিলিয়া সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস কামনা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল এবং তারপরেই প্রতিবেশীর জমিটুকু দখল করিবার মহদুদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

তারপরে শৃগালসমাজে প্রশ্ন দেখা দিল, এই পুঞ্জীভূত মনুষ্যত্ব লইয়া কি করা যায়। দধিকর্ণ বলিল মনুষ্যত্বকে মানুষেরা কখনো ব্যবহার করে না, দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়া দেয়, কাজেই আমরাও অনুরূপ ব্যবহার করিব। কিন্তু মনুষ্যত্ব এমনি পদার্থ যে, তাহা অজ্ঞাতসারে জীবকে প্রলুব্ধ করিতে থাকে। শৃগালেরা শিবারাজের বিনানুমতিতে বল্লম তলোয়ার প্রভৃতির ব্যবহার আবিষ্কার করিতে চেষ্টায় লাগিয়া গেল। একদিন একটি মানব শিশু পথ ভুলিয়া সেই বনে প্রবেশ করিল। আগে হইলে তাহাকে দংশন করিয়া শিয়ালেরা আহত করিত। একটি কৌতূহলী শিয়াল একখানা তলোয়ার দিয়া শিশুটিকে আঘাত করিল। শিশুটি অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত হইয়া নিহত হইল। মনুষ্যত্বের এই নূতন প্রয়োগে শিবাদল বিস্মিত হইল। তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—বাহবা! বাহবা! তা না হইলে মানুষ আর বড় কেন?

এই ঘটনার পর হইতে একদিকে রাজপ্রাঙ্গণের স্তূপীকৃত মনুষ্যত্ব যেমন ধীরে ধীরে অপহৃত হইতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি শিবাদলের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা বাড়িতে থাকিল। ক্রমে শিবারাজ্য নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে

শিবারাজ্যের সকলেই একদলভুক্ত ছিল। বল্লম, তলোয়ার প্রভৃতির একটি গুণ এই যে, ওসব বস্তু হাতে আসিলেই অপরকে মারিতে ইচ্ছা করে। আর মারামারি আরম্ভ হইলেই দলাদলি অনিবার্য্য। শিবারাজ্যে দলাদলি ও মারামারি কাটাকাটি সুরু হইয়া গেল। শিবারাজ দধিকর্ণ বিষম চিন্তিত হইয়া বলিল— শৃগালের পক্ষে মনুষ্যত্ব ব্যবহার করা কঠিন। কাজেই সে বল্লম-অর্ডিনান্স প্রচার করিয়া দিল। হুকুম হইল যে, সমস্ত বল্লম অবিলম্বে রাজবাড়ীতে ফেরৎ দিয়া যাইতে হইবে। শিবাদল আর যাহাই হোক বড়ই রাজভক্ত! তাহারা অগৌণে সমস্তগুলি বল্লম প্রত্যর্পণ করিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে শিবারাজ্যের হতাহতের সংখ্যা কমিল না। দধিকর্ণ গুপ্তচর দ্বারা সংবাদ লইয়া জানিল যে, শিয়ালেরা এখন তলোয়াররূপ মনুষ্যত্বের দ্বারা কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে। তখন চিন্তিত দধিকর্ণ সমস্ত শৃগাল সমাজের একটি মহতী সভা আহ্বান করিল—সভার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব বর্জ্জনের সহজতম উপায় ও আবশ্যক।

সভায় সকলে সমবেত হইলে দধিকর্ণ শৃগাল সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল—হে জগৎবরেণ্য শিবাকুল! যখন আমরা প্রথমে মনুষ্যত্ব লাভ করি অরণ্যের অন্যান্য পশু সমাজ আমাদের সৌভাগ্যে কতই না ঈর্ষ্যা করিয়াছিল—আমরাও নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, অভাবিতভাবে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রগতির পথে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গেলাম। কিন্তু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা অন্যরূপ হইয়াছে।

মনুষ্যত্ব শিবাকুল ক্ষয়ের কারণ হইয়াছে। নিত্যনিয়ত শৃগাল প্রাণ হারাইতেছে। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে—আমরা এখনো মনুষ্যত্বলাভের যোগ্য হই নাই। অতএব আমি আজ্ঞা প্রচার করিতেছি, যাহার কাছে যত তলোয়ার, বন্দুক প্রভৃতি মনুষ্যত্ব আছে, অবিলম্বে তাহা রাজভাণ্ডারে জমা দিতে হইবে। ইহার অন্যথায় বিষম দণ্ড অনিবার্য্য।

রাজার কথায় সকলেই সম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং সেই রাত্রেই নিজ নিজ অস্ত্রাদি প্রত্যর্পণ করিয়া গেল। সে রাত্রে দধিকর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল। তাহার নিদ্রা এমনই গভীর হইল যে, যথাসময়ে প্রহর জ্ঞাপন করিতেও সে ভুলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে রাজার দৌবারিক ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে মহারাজ, নিকটেই দুইটি শিবা নিহত হইয়া পড়িয়া আছে। রাজা শুধাইল—তাহারা মরিল কিরূপে? সকলেই তো মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করিয়াছে। দৌবারিক বলিল—কেমন করিয়া বলিব মহারাজ।

তখন দধিকর্ণ সপারিষদ অকুস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিল সত্য সত্যই দুইটি নিহত শিবা পড়িয়া আছে, নিকটে কোনরূপ অস্ত্রাদির চিহ্নও নাই, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে ইহারা পরস্পরকে হত্যা করিয়াছে। রাজা বলিল—ইহা কিরূপে সম্ভব?

তখন একজন পারিষদ তাহাদের দেহ গবেষণা করিয়া বলিল—মহারাজ ইহারা নখরাস্ত্রে পরস্পরকে নিহত করিয়াছে! নখরাস্ত্রে? সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল! কি আশ্চর্য্য!

দধিকর্ণ বলিল—শেষে মনুষ্যত্ব কি শৃগালের নখরে আশ্রয় গ্রহণ করিল ? হায় হায় এখন আমরা মনুষ্যত্বের কবল হইতে কিরূপে মুক্ত হইব ? কি কুক্ষণেই না পোড়া মনুষ্যত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলাম ? এই বলিয়া সে কপাল চাপড়াইতে লাগিল। তখন দধিকর্ণের সভাপণ্ডিত বলিল—মহারাজ আমার কেমন যেন সন্দেহ হইতেছে যে, মনুষ্যত্বের প্রধান আশ্রয় মন। সেখান হইতে তাহাকে দূর করিতে না পারিলে হত্যাকাণ্ড দূর করা সম্ভব নহে।

দধিকর্ণ বলিল—মন বলিয়া যে কিছু আছে তাহা এই প্রথম শুনিলাম। বিশেষ মন নামক পদার্থ শরীরের কোন্ অঙ্গে থাকে তাহাও অজ্ঞাত।

সভাপণ্ডিত বলিল—মহারাজ সে তথ্য আমিও অবগত নহি। তবে নিশ্চয় এই যে, মনের পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে কেবলমাত্র মনুষ্যত্ব বর্জ্জন দ্বারা হত্যাকাণ্ডের নিবারণ সম্ভব নহে।

তখন এই মহাসমস্যার সমাধান খুঁজিয়া না পাইয়া শিবাকুল সমস্বরে হুয়া ! হুয়া ! করিয়া ডাকিতে লাগিল।

যতদূর জানি এই প্রথা মনুষ্য সমাজেও প্রচলিত আছে। সমস্যাকে চাপা দিবার জন্য চীৎকার করা—মানুষের প্রকৃতিগত সংস্কার।

শকুন্তলা

অতীশ ও মালতী এইমাত্র হিন্দু বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ-পর্ব্ব সমাধা করিয়া বাসর-ঘরে আসীন হইয়াছে। বন্ধুরা ফুলের মালা, ফুলের তোড়া দিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। অতীশ হাসিতেছে, মালতী নতমুখী। এইখানে আমাদের গল্পের শেষ, আরম্ভটা অনেক আগে—আর অন্যত্রও বটে। বঙ্গোপসাগরে আসিয়া যে-জলধারার সমাপ্তি, তাহার সূত্রপাত হিমালয়ের দুর্গম শিখর-মালার অরণ্যে। আমাদের এবার সেই তুষারিক নির্জ্জনতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।

সাঁওতাল পরগণার পরিজ্ঞাত সহরগুলি রুগ্ন স্বাস্থ্যান্বেষীদের নিশ্বাসবিষে কলুষিতপ্রায় হইয়া উঠিলেও, এখনও অম্লানবায়ু স্থানের সেখানে অভাব নাই। এই স্থানগুলি রেলষ্টেশনের পরিধির মধ্যে পড়ে না—তাই জনসমাগম নাই বলিলেই হয়। বিশুদ্ধ বাতাহারী বায়ুগ্রস্তদের কেহ কেহ দু'চারখানা বাড়ী-ঘর তৈয়ারি করিয়াছে এইমাত্র। বায়ু এখানে নিষ্কলুষ হইলেও শুধু বায়ুতে মানুষের জীবন চলে না। দূরবর্ত্তী সহর হইতে প্রাণধারণের অন্য সব সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া নিতান্ত বাতাশ্রয়ী ব্যক্তি ছাড়া কেহ এখানে ইচ্ছা-সুখে বড় আসে না। অতীশ সেই বায়ুমার্গীয় লোকেদের অন্যতম। সে তাহার পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। স্থানটির নাম জোড়া-মউ।

বন্ধুরা শুধায়—মানাচত্রে এত স্থান থাকিতে এমন তেপান্তরের মাঠে কেন ?

অতীশ বলে—কলিকাতার বহুজনীয়তার প্রতিষেধক এই স্বল্পজনীয় তেপান্তরের মাঠ।

বন্ধুরা আবার বলে—তবে তেপান্তরের উপমাটা পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোল না কেন ? রাজকন্যা কি জুটিল ?

অতীশ হাসিয়া বলে—এখনও জোটে নাই বটে, তবে জুটিতে কতক্ষণ ?

এপারের উচ্চ ভূখণ্ডে জোড়া-মউ। ওপারের উচ্চতর ভূখণ্ডে মদন-কোঠা, মাঝখানে স্ফটিক জলের জয়ন্তী নদী। নদীর ধারে অনেকটা স্থান জুড়িয়া শাল, হর্ত্তুকি, মহুয়ার

অতীশ নিত্যকার মতো প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। শরৎ কালের মাঝামাঝি। বৃষ্টি-বাদল কাটিয়া গিয়াছে—অথচ শীতের প্রভাব এখনো পড়ে নাই—ঘাসের ডগায় ডগায় শিশিরবিন্দু ঝলমল-করা সকাল বেলা; দিগন্তে কুয়াশার ছোপ লাগিয়াছে—অথচ আকাশের নির্ম্মল নীলে স্বচ্ছতম মেঘের অন্যতম চিহ্নও নাই! নিখিল প্রকৃতি সন্ত-খনিত কুমারী সরসীর মতো কূলে কূলে পূর্ণ—এখনও তাহাতে প্রথম কলসটিও ডুবানো হয় নাই। অতীশ এই পূর্ণতার মধ্যে নিজেকে প্রতিদিন প্রভাতে একবার নিমজ্জিত করিয়া লয়।

এমন সময়ে সে চমকিয়া উঠিল—কে যেন খিল-খিল করিয়া হাসিতেছে ? এখানে এই নির্জ্জনতায় হাসিতেছে কে ?

না গৃহকার্য্যে নিরত দিগ্বালার হাতের রেশমী চুড়ি নাড়া খাইয়া বাজিয়া উঠিল ? অতীশ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ক্রমে তাহার কাণে মানবকণ্ঠ—মানবী-কণ্ঠ বলিলেই যথোচিত হয়, প্রবেশ করিল।

একটি কণ্ঠ বলিল—ভাই, আমার গায়ের চাদরখানা একটু জড়িয়ে দাও না।

অপর কণ্ঠ বলিল—মালতী দি, তোমার চাদরখানা না হয় খুলেই রাখো।

অতীশ বুঝিল কণ্ঠাধিকারিণীদের অন্যতমার নাম মালতী। কিন্তু কোথায় তাহারা ? সে আর একটু অগ্রসর হইতেই রহস্য ভেদ হইল। বন্ধুর তরঙ্গায়িত ভূমির দুই তরঙ্গের মধ্যস্থিত উপত্যকায়, নদীর তীরে, শাল-মহুয়া বনের পাশে কয়েকটি মেয়ে চড়িভাতির আয়োজনে ব্যস্ত। অতীশ উচ্চভূমি হইতে তাহাদের দেখিল—তাহারা নীচু হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল না। অতীশ ভাবিল—এযে মহুয়া বনের শকুন্তলা। যদিচ নদীটার নাম মালিনী নয়—তবু সমীচারিণী শকুন্তলার সঙ্গে ইহাদের তেমন প্রভেদ নাই। সে এমন এক স্থানে বসিল, যাহাতে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়—অথচ তাহারা অতীশকে দেখিতে না পায়।

একটি নারী-কণ্ঠ বলিল—ভাই এ যে তেপান্তরের মাঠ, তার উপরে কাছেই বন, হঠাৎ একটা বুনো ভালুক এসে পড়লে কে রক্ষা করবে ?

অপর কণ্ঠ তাহার উত্তরে বলিল—তেপান্তরের মাঠ হ'লে

তেপান্তরের রাজপুত্রও নিশ্চয় আছেন—রক্ষা করবার ভার তাঁরই উপরে—'কেন না রাজারাই আশ্রমের রক্ষক।'

অতীশ বুঝিল ইঁহাদের পরিচয় যাহাই হোক, শকুন্তলা নাটকখানা ইঁহারা ভালো করিয়াই পড়িয়াছেন। মেয়েগুলি শিক্ষিতা। অতীশ বসিয়া রহিল—দেখা যাক, নাটক আর কত দূর গড়ায়।

এমন সময় নারী-কণ্ঠসমূহ ভীত কোলাহল করিয়া উঠিল। অতীশ ভাবিল এতগুলি কণ্ঠ আসিল কোথা হইতে? মেয়ে তো ছিল গুটিতিনেক। কণ্ঠস্বর শুনিয়া মেয়েদের কণ্ঠসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে।

কোন কণ্ঠ বলিল—ভালুক।

কেহ বলিল—বাঘ।

কেহ বলিল—বুনো শূওর।

সকলেই বলিল—কে আছগো—বাঁচাও।

অতীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল—ব্যাপার কি? সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সে হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। সাঁওতালদের গোটা কয়েক পোষা শূওর মেয়েদের দিকে আসিতেছিল—মেয়েদের কোলাহলে ভীত হইয়া এক্ষণে পলাইতেছে—বাঘও নয়, ভালুকও নয়, তবে শূওর বটে, কিন্তু বন্য নয়।

মেয়েদের কোলাহল তবু থামে না। তখন অতীশের মনে হইল—একবার অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাদের অভয় দেওয়া উচিত।

সে চীৎকার করিয়া উঠিল—ভয় নাই, আমি আছি—এবং তখনই নীচের দিকে ছুটিয়া চলিল।

নিকটেই রক্ষককে দেখিয়া মেয়েদের সাহস ফিরিয়া আসিল। তাহারা বলিল—আমরা একটু ঠাট্টা করছিলাম—ভয় পাবো কেন ?

কিন্তু তাহাদের কম্পমান শরীর ও ভূলুণ্ঠিত চাদর অন্যরূপ সাক্ষ্য দিতেছিল।

অতীশ পুনরায় বলিল—ভয় নাই, আমি আছি।

*　　*　　*　　*

রাজা। ভয় নাই, ভয় নাই……

শকুন্তলা। আঃ, এই দুষ্ট মধুকর এখনও নিবৃত্ত হইতেছে না, আমি এখান হইতে অন্যত্র যাই।

রাজা। দুর্বিনীতের শাসনকর্ত্তা পুরুবংশীয় রাজার শাসনকালে সরলহৃদয়া তাপসবালাদিগের প্রতি এইরূপ অসদ্ব্যবহার করে, এমন সাধ্য কাহার ?

অনসূয়া। আর্য্য ! কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই। আমাদের এই প্রিয়সখী মধুকর কর্ত্তৃক আকুল হইয়া কাতর হইয়াছেন।

রাজা। অয়ি, আপনার তপস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তো ?

অনসূয়া। এখন বিশিষ্ট অতিথি লাভে তপস্যা বর্দ্ধিত হইল। শকুন্তলে ! তুমি শীঘ্র কুটীর হইতে ফল ও অর্ঘ্যপাত্র আনো, এই ঘটের জল পাদোদক হইবে।

রাজা। আপনাদের মিষ্ট সম্ভাষণেই আমার আতিথ্য হইয়াছে।

প্রিয়ম্বদা। তবে এই ছায়া-শীতল সপ্তপর্ণ-বেদিকায় মুহূর্ত্তকাল উপবেশন করিয়া পরিশ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। তোমরাও এই জল-সেচন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ।

অনসূয়া। শকুন্তলে! অতিথির অভিপ্রায় মতো কার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। অতএব এসো, আমরাও উপবেশন করি।

শকুন্তলা। (স্বগত) এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে আশ্রমবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন?

*   *   *   *

অতীশ বলিল—আপনারা খুব ভয় পেয়েছিলেন না?

একটি মেয়ে বলিল—না, না, আমরা ঠাট্টা করছিলাম।

অতীশ শুধাইতে পারিত—কাহার সঙ্গে! কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শুধাইল—তা হবে—কিন্তু লোকে শুনলে ভয় পেয়েছিলেন বলেই মনে করবে।

অতীশ দেখিল মেয়েরা চড়িভাতি করিতে আসিয়াছে—হাঁড়ি-কুড়ি, চাল-ডাল রহিয়াছে। সে বলিল—যাই হোক, এত সকালে একলা আপনাদের এমন নির্জ্জন স্থানে আসা উচিত হয়নি।

একতমা বলিল—ঠাকুর, চাকর আমাদের সঙ্গে আছে—তারা এখনো এসে পৌঁছয়নি।

ইহা শুনিয়া সে বলিল—তবে তো রক্ষক আপনাদের সঙ্গেই আছে। আর যদিই বা না থাকৃতো তবু ভয়ের কারণ নেই—

যেহেতু এখানকার বনে বাঘ-ভাল্লুক তো দূরের কথা একটা শিয়াল পর্য্যন্ত নেই। ইতস্ততঃ পোষা শূওর থাকা বিচিত্র নয়। তবে কারো কারো ভয় পাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

কথাটা বলিয়াই সে বুঝিল—মন্তব্যটা একটু রূঢ় হইয়া গিয়াছে। নিজের ত্রুটি সারিয়া লইবার উদ্দেশ্যে সে বলিল—তবে আমি এখন আসি।

এবারে যে মেয়েটি কথা বলিল—তাহার নাম মালতী। মালতী বলিল—কিন্তু আপনাকে না খেয়ে যেতে দিচ্ছে কে?

অতীশ মৃদু আপত্তি করিল। কিন্তু তাহার স্বরে বুঝিতে পারা গেল, না খাইয়া এবং খুব সম্ভব খাওয়ার পরেও তাহার যাইবার ইচ্ছা আদৌ নাই।

অপরাহ্নে আহারাদি শেষ হইলে মেয়েরা বিদায় লইবার আগে অতীশের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইল যে, সে তাহাদের আশ্রয়ে একবার গিয়া দেখা দিয়া আসিবে।

অতীশ তার পরদিনই সেখানে গেল এবং তার পরদিন এবং তার পরদিন এবং জোড়া-মউতে সে যতদিন ছিল প্রতিদিন একবার করিয়া গেল। সেবারে জোড়া-মউ হইতে কলিকাতায় ফিরিতে তাহার অনেক দেরী হইল।

অতীশের প্রমুখাৎ মেয়ে তিনটির যে ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাহাই বলিব—আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, জোড়া-মউর অপর পারে, জয়ন্তী নদীর ধারে মদন-কোঠা। সেখানে মিশনারিদের একটি

বালিকা-বিদ্যালয় আছে। আশে-পাশের সাঁওতাল ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্যই ইস্কুলটি স্থাপিত। মেয়ে তিনটি সেই ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী—মালতী হেড-মিসট্রেস্। এখন পূজার ছুটি উপলক্ষে ইস্কুলটি কয়েক দিনের জন্য বন্ধ। সামান্য কয়েক দিনের ছুটি বলিয়া তাহারা বাড়ী যায় নাই। সেদিন সকালে তাহারা পূর্ব্বোক্ত স্থানে চড়িভাতি করিতে আসিয়াছিল।

মেয়ে তিনটির একতমার নাম মালতী, অপর দু'জনের নাম রমা ও বিনতা। কাল তাহাদের ইস্কুল খুলিবে, অতীশেরও কাল কলিকাতা রওনা হইবার কথা। আজ মালতীর নিমন্ত্রণে সে চা খাইতে আসিয়াছে।

ইস্কুলটি ছোট, একপাশে শিক্ষয়িত্রীদের বাসের স্থান, চার দিকে ফুলের বাগান আর শাল, মহুয়া, অর্জ্জুন ও সেগুনের গাছ। এই গাছগুলির জন্যই জোড়া-মউ হইতে ইস্কুলটি দেখা যায় না—নতুবা মাঠের মধ্যে দেখা না যাইবার কথা নয়।

মালতীর ঘরের বারান্দায় চৌকি ও টেবিল পাতা। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম ও খাদ্য। মালতীরা তিনজন ও অতীশ ছাড়া আর কেহ নাই। চারজনের মধ্যে আজ গল্প-গুজব খুব জমিয়া উঠিয়াছে—তার মধ্যে অতীশ ও মালতীই বেশী মুখর। সে কি কাল বিদায়ের দিন বলিয়া, না বিদায়ের ব্যথাকে চাপা দিবার জন্যই? মধ্য-সমুদ্রে ঢেউ নাই—উপকূলের কাছেই তরঙ্গের বিক্ষোভ।

চা-পান শেষ হইলে অতীশ বলিল—চলুন, সকলে মিলে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। 'সকলে মিলে' বলিলেও সে মনে

মনে আশা করিতেছিল 'সকলে' তাহার অনুগমন করিবে না। প্রেমের ব্যাকরণে 'দ্বিবচনেই' চরম, বহুবচন বলিয়া কিছু নাই।

তাহারা চারজনেই বাহির হইল বটে—কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই রমা ও বিনতা পিছাইয়া পড়িয়াছে, অতীশ ও মালতী একটি ভূ-তরঙ্গের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সমস্ত প্রান্তরখানা এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে—তাহার নিম্নতম অংশে জয়ন্তী নদীর বালুশয্যা দেখা যায়, সেখান হইতে জমি আবার উঁচু হইতে হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—দিগন্তের ধারে ঝাপসা বনরেখা। অতীশ ও মালতী সেই উপত্যকার প্রান্তে বসিল।

মালতী শুধাইল—কাল তা'হলে নিশ্চয় যাচ্ছেন?

অতীশ বলিল—হাঁ। আপনিও একবার কল্‌কাতায় চলুন না কেন?

মালতী বলিল—ছুটি কোথায়? তার চেয়ে আপনার আসাই তো সহজ।

অতীশ বলিল—বড়দিনে আসবার চেষ্টা করবো।

অতি তুচ্ছ সব কথা। মহৎ কথার সূত্র তুচ্ছ কথা—সামান্য বনলতার সূত্রে যেমন বকুলের মালা গাঁথা। কিন্তু এক সময়ে এই তুচ্ছ কথাও থামিয়া গেল। বাতাস পড়িয়া গেলে বুঝিতে পারা যায় এইবার বৃষ্টি নামিবে।

কিছুক্ষণ দুইজনে নীরব। হঠাৎ অতীশ বলিয়া বসিল—মালতী, তোমাকে আমি ভালবাসি। মালতী কোন উত্তর না দিয়া আঙ্গুল দিয়া আঁচলের প্রান্ত বারংবার জড়াইতে ও খুলিতে লাগিল।

—আঃ, কাপড়খানা নষ্ট করে ফেললেন যে ! বলিয়া অতীশ মালতীর অপরাধী হাতখানাকে নিজের হাতে বন্দী করিল। সত্যই কাপড়খানার প্রতি তাহার গভীর দরদ !

*　　*　　*　　*

শকুন্তলা। আমাকে একাকিনী ফেলিয়া সখীরা যে সত্য সত্যই প্রস্থান করিল।

রাজা। সুন্দরি ! তোমার শুশ্রূষার জন্য আমিই তোমার সখীদের স্থান অধিকার করিলাম। এখন কি করিতে হইবে ?

শকুন্তলা। সম্মানিত ব্যক্তির নিকট নিজেকে অপরাধী করিতে আমার বাসনা নাই। [প্রস্থানের উদ্যোগ]

রাজা। সুন্দরি ! দিবাভাগের সন্তাপ এখনো সম্যক্ দূর হয় নাই—এখন তুমি কি প্রকারে গমন করিবে ?

শকুন্তলা। ছাড়ুন, ছাড়ুন, আমাকে ধরিবেন না।

রাজা। ধিক্, বড়ই লজ্জা পাইলাম।

শকুন্তলা। আমি মহারাজকে কিছুই বলি নাই, আপনার দৈবকে নিন্দা করিতেছি মাত্র।

রাজা। নিজের ইষ্টসাধন কেন না করি ? [নিকটে গিয়া শকুন্তলার অঞ্চল ধারণ করিলেন।]

শকুন্তলা। হে পৌরব ! বাসনা পূর্ণ না করিলেও এই অভাগিনী শকুন্তলাকে ভুলিবেন না।

নেপথ্যে। চক্রবাক্-বধূ ! আপনার সহচর চক্রবাকের সহিত সম্ভাষণ কর ; ঐ দেখ, রাত্রি সমাগত।

শকুন্তলা। আর্য্যপুত্র ! আর্য্যা গৌতমী এই দিকে আসিতেছেন।

*　　*　　*　　*

এমন সময় রমা ও বিনতার গান অদূরে শ্রুত হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা চারজনে ইস্কুল-বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তখন পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। অস্ত-সূর্য্যের রশ্মি-রসে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল প্রভাবিত। চারজনে নীরবে অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

তার পরে মাস দুই গত হইয়াছে। বড়দিনের ছুটিতে সন্ধ্যা বেলায় অতীশ ও মালতী ঠিক সেইখানেই আবার উপবিষ্ট। দুইজনেই নীরব। মাত্র কয়েক মিনিট আগে অতীশ মালতীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। মালতী কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়াছিল—কি ভাবিতেছিল জানি না। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে ইন্দ্রধনু ফুটিয়াছে—তাহারই প্রান্তভাগ দিগন্তের যেখানে নামিয়া পড়িয়াছে—সেখানকার তরুরাজিতে অলৌকিক বর্ণের তুলি বুলানো। মালতী এই অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছিল। হয়তো সে ভাবিতেছিল— ওই যে দিব্য জ্যোতি, কিছুক্ষণ পরেই তাহার আর কোন চিহ্ন থাকিবে না, মলিন তরুরাজি অধিকতর মলিন হইয়া দেখা দিবে। এই দৃশ্যের উদাহরণ সে কি নিজের জীবনেও সন্ধান করিতেছিল? প্রেমের পূর্ব্বরাগের বিভা কি অমনি ক্ষণস্থায়ী নয়? বিবাহিত সংসারে কি তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে? যদি না হয় তবে পূর্ব্বরাগের জ্যোতির তুলনায় সংসার কি মলিন মনে হইবে না? সে মলিনতা

বহন করিবার ক্ষমতা কি তাহার আছে? কোন মানুষেরই কি আছে?

বিবাহ সম্বন্ধে মালতীর একটি ধারণা ছিল। ভালবাসিয়া বিবাহ করিলে তাহার পরিণাম শুভ হয় না। বিবাহের পরে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এক প্রকার দাম্পত্য-রস জাগ্রত হয়, সুখে দুঃখে দু'জনের জীবন এক রকম করিয়া চলিয়া যায়—কিন্তু তাহা ভালবাসা নয়। কিন্তু যে-হতভাগ্যেরা পূর্ব্বরাগের ইন্দ্রধনুর সূত্র ধরিয়া বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে—আশাভঙ্গজনিত দুঃখ তাহাদের ভাগ্যে সুনিশ্চিত। সে স্থির করিয়াছিল যদি কখনো বিবাহ করে—তবে গতানুগতিক ভাবেই করিবে—ভালবাসিয়া করিবে না। কিন্তু অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা! অতীশ তাহাকে ভালবাসিয়াছে--সেই অতীশ আবার বিবাহের প্রস্তাব করিল। সে-ও অবশ্য অতীশকে ভালবাসে। এখন কিং কর্ত্তব্য?

বিবাহ-বিষয়ক এই ধারণা কোন গ্রন্থ হইতে সে সংগ্রহ করে নাই। তাহার বিবাহিতা বন্ধুনীদের জীবনের অভিজ্ঞতা দেখিয়া সে সঞ্চয় করিয়াছে। ইহাকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাহার নাই—হয় তো ইহা অমূলক। কিন্তু ওই ইন্দ্রধনুখানাও তো অমূলক—তাই বলিয়া তাহা তো মিথ্যা নয়।

কিন্তু মানুষ এমনি দুর্ব্বল যে, পরিণাম জানিয়াও তাহাকে নিজের বিরুদ্ধে যাইতে হয়। গুড ফ্রাইডের ছুটিতে আবার অতীশ আসিয়াছে। সেবারে নিজের প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া সে ফিরিয়া গিয়াছিল। এবারে নূতন উদ্যমে আসিয়া সে উত্তর

আদায় করিয়া লইয়াছে এবং বোধ করি উত্তরটা তাহার অপ্রীতিকর হয় নাই।

অতীশ এবার সঙ্গে একখানা মোটরকার আনিয়াছে। সেই গাড়ীতে করিয়া তাহারা দুইজনে দগ্ধ প্রান্তরের তাম্র পথ বাহিয়া দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই দিকে পলাশের বন আপাদমস্তক পুষ্পিত।

অতীশ বলিতেছে—আমরা যেন ইস্কুলপলাতক, ছুটেছি আকাশ-প্রান্তরে প্রেমের পিকনিকে আর ওই পলাশের গাছ জ্বালিয়েছে রঙ্গীণ ফুলের মশাল—

মালতী বলিল—কিন্তু মশাল তো একদিন নিববেই—

অতীশ বলিল—কোন্ মশাল না নেবে? আর আমাদের পিকনিকই কোন্ চিরস্থায়ী?

মালতী—সেই তো ভয়—

অতীশ বাধা দিয়া বলিল—মালতী, তোমার ওই ভয়ের কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না। আজ যদি তোমাকে ভালবাসি—বিয়ের পরে পারবো না কেন?

মালতী—কেন তা জানি না। বোধ করি বিবাহেরই তা ধর্ম্ম, বোধ করি ভালবাসারই তা প্রকৃতি—কিন্তু পারে না দেখছি—

অতীশ—কেউ যদি না পারে তাই বলে আমি পারবো না কেন?

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

সেই দ্রুত ছুটন্ত গাড়ীর মধ্যে বসিয়া কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল—এই পলাশের মায়া, এই বসন্তের জাদু যেমন

চিরস্থায়ী নয়, ফাল্গুনের এই বনানীকে বৈশাখে যেমন অপরিচিতবৎ বলিয়া মনে হইবে, তেমনি প্রাক্-বিবাহ মালতীকে কি বিবাহোত্তর মালতী হইতে ভিন্ন মনে হইবে না? যদি হয়, তবে অতীশের কি আশাভঙ্গ হইবে না? আশাভঙ্গ হইলে তাহা পূরণ করিবার ক্ষমতা কি তাহার, মালতীর আছে? যদি না থাকে তবে দু'জনের জীবনই না কি বিষম দুর্ব্বহ হইবে? অতীশ দেখিতেছে পলাশ বনের প্রলাপ! সে ভাবিতেছে ফুলের এত ছায়া-সুষমা, এত ছায়াতপও আছে—পলাশ ফুলের রঙ লাল, এ কথা কেবল অন্ধেই বলে। পলাশ ফুলের হাজার রকম রঙ—লাল তার মধ্যে অন্যতম। তাহার মনে হইল—কে বলিল ইহা ক্ষণস্থায়ী—যখন সাক্ষাৎ দেখিতেছি, অন্যথা প্রমাণিত না হওয়া অবধি ইহাই একমাত্র সত্য।

মালতী ভাবিতেছে—এ জাদু তো অন্তর্হিত হইল বলিয়া? বৈশাখের শুষ্ক বনস্থলীর উদাসী নিশ্বাস ইতিমধ্যেই কি জীর্ণ পত্রের মর্ম্মরে শ্রুত হইতেছে না? হায়! হায়! এমন ক্ষণিকের উপরে বিশ্বাস রাখিয়া কে ঘর বাঁধে? মরীচিকা নদীর তীরে স্ফটিকের ঘাট বাঁধিবার ক্ষতিপূরণ কোন কালে কি সম্ভব?

দু'জনের চিন্তা জীবন-কোদণ্ডের দুই কোটি আশ্রয়ী—ইহাদের মিলন কি করিয়া সম্ভব? আশাভঙ্গ অনিবার্য্য? তখন, তখন কি হইবে? তখন কি পরস্পরের বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া উঠিবে না? তখন কি তাহাদের মনে হইবে না—একে অপরের সহিত ছলনা করিয়াছে? আজ যাহারা সরসতম মিত্র, তখন কি তাহারাই চরমতম শত্রুতে পরিণত হইবে না?

বিবাহের হোমানলে পূর্ব্বরাগের দেবতা কন্দর্প কি নিত্য-নিয়ত ভস্মীভূত হইতেছেন না? তবে এ চেষ্টা কেন? তবু এ চেষ্টা কেন? পূর্ব্বরাগের বিনি সূতায় বনফুল গাঁথা চলে, কিন্তু বিবাহের যৌতুকের গুরুভার মণিমুক্তা গাঁথিবার এ বৃথা চেষ্টা কেন? মানুষে ইহা বুঝিয়াও বোঝে না। মালতী ভাবিতেছে—অতীশ বুঝিল না। অতীশ ভাবিতেছে—মালতী পাগল।

তারপর একদিন শুভ লগ্নে অতীশ ও মালতীর বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এই সংবাদ গল্পের প্রারম্ভেই আমরা দিয়াছি। বন্ধুরা বিদায় লইলে বাসর ঘরের দরজা বন্ধ হইল। সকাল বেলার দীপ্ত আলোকে তাহারা পরস্পরকে দেখিল।

*

রাজা। ভগবান্ কণ্ব কি আদেশ করিয়াছেন?

শার্ঙ্গরব। তিনি বলিয়াছেন, আপনি নির্জ্জনে গান্ধর্ব্ব-বিধানে তাঁহার এই কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ধর্ম্মাচরণার্থ ইহাকে এখন গ্রহণ করুন।

রাজা। ইহা আমার নিকট উপন্যাস বলিয়া বোধ হইতেছে।

শার্ঙ্গরব। আপনি ইহাকে উপন্যাস বলিতেছেন কেন?

রাজা। আমার সহিত কি ইহার পরিণয় হইয়াছে?

শকুন্তলা। হৃদয়! তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহাই ঘটিল।

গৌতমী। বৎসে, একবার লজ্জা ত্যাগ কর, আমি তোমার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিতেছি।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) এই অম্লানকান্তি সুন্দর রূপ যে পূর্ব্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, চিত্তনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা

করিয়াও তো তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

শকুন্তলা। যদি প্রকৃত পক্ষেই আপনি পরদারা জ্ঞানে আশঙ্কা করেন, তবে কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাইয়া আপনার সে আশঙ্কা দূর করিতেছি।

রাজা। সেই কথাই ভালো।

শকুন্তলা। (অঙ্গুরীয় স্থান দেখিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! আমার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় নাই।

* * * *

বিবাহিত জীবনের প্রথম আলোকে অতীশ ও মালতী পরস্পরকে দেখিল। অতীশ নিজের অগোচরে চমকিয়া উঠিল—একটি অতি-ক্ষুদ্র, অতি-গুপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস অলক্ষ্যে তাহার বক্ষ হইতে নিঃসৃত হইল। তাহার কেন যেন মনে হইল—এই কি সেই মালতী? মালতী বিস্মিত হইল না। সে তো পূর্ব্বাহ্নে সমস্তই কল্পনা করিতে পারিয়াছিল। অতীশের মুখে পূর্ব্বগামিনী ছায়ার আভাস লক্ষ্য করিয়া সে নীরবে নিজের অনামিকার দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। সে কি শকুন্তলার মতোই ভাবিতেছিল না,—হা ধিক্! হা ধিক্! আমার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় নাই!

সুতপা

যে সব গুণ ও যে-পরিমাণ রূপ থাকলে বিয়ের বাজারে উচ্চ চাহিদা হয় তার সবগুলি থাকা সত্ত্বেও সুতপা যখন বুঝতে পারলো বিয়ে তার হবার নয়—সে আর দশজন মেয়ের মতো আশাতীতের পিছনে বৃথা ছুটোছুটি না করে জীবন-ক্যালেণ্ডারের সে পাতাখানাকে ছিঁড়ে ফেলে দিল। এবারে তার জীবনে এলো ইস্কুল-মাষ্টারির অধ্যায়। বাংলাদেশের বাইরে ছোট একটি সহরে মেয়ে-ইস্কুলের মাষ্টারি নিয়ে সে চলে গেলো। তার উপরে নির্ভর করে সংসারে এমন কেউ তার ছিল না—সে স্থির ক'রে ফেল্‌লো আর কারো উপরেও সে নিজের ভার চাপাবে না। তারপরে একদিন সে নিজের বিছানা বেঁধে, তোরঙ্গ সাজিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে চড়ে বস্‌লো। সে আজ অনেক দিনের কথা।

সুতপা আট বছর এই ইস্কুলে মাষ্টারি করছে বটে, কিন্তু কালের হিসাব আর মনের হিসাবে সব সময়ে খাপ খায় না—তার মনে হয় কত জন্ম ধরে' যেন এখানে সে আছে—আরো কত জন্ম তাকে থাকতে হবে। তার মনে পড়ে যায়, বাল্যকালে সে একবার তার পিতার সঙ্গে নৌকোয় ক'রে মস্ত এক নদী পাড়ি দিয়ে রেলষ্টেশনে আসছিল—একদিকে সরু নীল পাড়ের মতো তীরের রেখা—আর একদিকে ঝাপসা আবছা দিগন্ত—আকাশ আর জল মিশেছে বলে মনে হয় না। সুতপার মনে

হয়, এখনো যেন সেই নদীপথেই সে চলেছে—অতীতের দিকে অতি দূরে পূর্বজীবনের ক্ষীণতম একটুখানি আভাস—ভবিষ্যতের দিকে কেবলি অশ্রুর ঘনতর বাষ্প, তীরের লেশমাত্র নেই। সে স্থির ক'রে নিয়েছে এমনি ক'রেই ভাস্তে ভাস্তে অবশেষে একদিন জীবনের প্রান্তে এসে পৌঁছবে।

ইস্কুলের কাজের ছকের সঙ্গে তার জীবনটা এতদিনে খাপে খাপে মিলে যাওয়া উচিত ছিল, গিয়েছেও তাই। কিন্তু বিপদ হয় ছুটিগুলোকে নিয়ে। ইস্কুলের জীবন নিরেট কাজ নয়—লম্বা, এবং ছোটখাটো ছুটির টুক্‌রো সাজিয়ে তৈরি। ওই ছুটিগুলোকে নিয়ে সুতপা পড়ে বিপদে। হাতের প্রচুর অবসর আর মনের গভীর শূন্যতা দুইয়ে মিলিয়ে তার মনে আদিম একটা অরাজকতার সৃষ্টি করে। নিজের ছোট ঘরখানির শূন্য শয্যায় শুয়ে একখানা বই খুলে নেয়। মনোযোগ বইয়ের পাতার অক্ষরের কালো রেখা ধরে প্রথম প্রথম বেশ ছুটতে থাকে—কিন্তু হঠাৎ কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই গাড়ী এক লাইন থেকে আর এক লাইনে যায় চলে—আর একদিন অনায়াসে জীবন-ক্যালেণ্ডারের যে-পাতাখানাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কোন্ সঞ্চিত দীর্ঘনিশ্বাসের ঘূর্ণিহাওয়ায়, সেখানা উড়তে উড়তে কোলের উপরে এসে পড়ে—সুতপা চমকে ওঠে!

মিহির বলে,—চলো বেড়িয়ে আসি।

সুতপা বলে,—চলো!

মিহির একখানা গাড়ী ডাকে।

সুতপা বলে,—আবার গাড়ী কেন?

মিহির বলে,—কল্‌কাতার পথে লোকজন ঠেলে আর অপঘাত বাঁচিয়ে চল্‌তে গিয়ে মনোযোগের পনেরো আনাই মাঠে মারা যায়—পরস্পরের জন্য আর বাকি থাকে না। গাড়ীর স্থবিধে এই যে, গাড়োয়ানটাকে ভিড় ঠেলে চলবার ভার দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে গল্পগাছা করা যায়।

দু'জনে গাড়ীতে উঠে বসে।

ক্যালেণ্ডারের তারিখের কালো খোপগুলোর মাঝে মাঝে এক একটা লাল তারিখ—কালোর ঘের-দেওয়া লাল অঙ্ক।

গাড়ী চল্‌ছে। মিহির কথা বলে না, মুখ ভারি ক'রে থাকে। একটুতেই মিহিরের রাগ করা অভ্যাস। নিরুপায় স্থতপা হ্যাণ্ড-ব্যাগ খুলে ফেলে ছোট্ট একখানি রুমাল বের করে; ভাঁজ খুলে ফেল্‌তেই বেরিয়ে পড়ে কয়েকটি শুভ্র বেল ফুল। স্থতপা বলে,—এই নাও, সন্ধি স্থাপন করলাম।

মিহির ফুলগুলোর সঙ্গে রুমালখানা টান দিয়ে নিয়ে পকেটে ভরে।

স্থতপা বলে,—ও কি ?

মিহির বলে,—কেন পতাকা।...আচ্ছা এ ফুল কি আমার জন্যে এনেছিলে ?

স্থতপা গম্ভীরভাবে বলে,—না।

আবার ওর মুখ ভারি হয়। দু'জনেই জানে এ ফুল কার জন্যে আনা। তবে একজনেরই বা কেন জিজ্ঞেস করা এবং আর একজনেরই বা কেন অস্বীকৃতি ? কিন্তু সংসারে নিরন্তর

কি এমনি ঘট্‌ছে না ? যে-চোর হাতে-নাতে ধরা পড়েছে সেও তো দোষ স্বীকার করে না।

এমন সময়ে গাড়ী ধাক্কা খায়। সুতপা চমকে ওঠে। নাঃ গাড়ীর ধাক্কা নয়—চন্দনী এসে দরজায় ধাক্কা মারে। চন্দনী ওর ঝি।

চন্দনী বাইরে থেকে বলে,—দিদিমণি চায়ের সময় হয়েছে।

সুতপা তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে ওঠে—ক্যালেণ্ডারের ছিন্ন পাতাখানা হঠাৎ উড়ে চলে যায়—খুব দূরে নয়—কাছেই কোথাও লুকিয়ে থাকে পুনরাবির্ভাবের সুযোগে।

সুতপা ছোট্ট একখানি বাড়ী পেয়েছে—সরকারী পরিভাষায় যাকে বলে 'ফ্রি কোয়ার্টার'। একটি ছোট ড্রয়িংরুম, একটি বেড রুম। সমুখে একটি জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দা, পিছন দিকে বাঁধানো উঠোন, রান্নাঘর, স্নানের ঘর—সবই আছে অল্পর মধ্যে। চন্দনী ওর ঝি—প্রথম থেকেই আছে সুতপার সঙ্গে। রাঁধে বাড়ে, সুতপাকে খাওয়ায়, নিজে খায়। চন্দনী ওইখানেরই লোক।

ইস্কুল খোলা থাক্‌লে সুতপা দশটার মধ্যে খাওয়া সেরে সেজে নিয়ে বেরুবার আগে একবার আয়নার সমুখে দাঁড়ায়। এলোমেলো চুলগুলোকে কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে, মুখের উপরে একবার রুমাল বুলিয়ে, দরজা বন্ধ ক'রে ইস্কুলে চলে যায়। চন্দনী বাড়ীতে থাকে। আবার ইস্কুল থেকে ফিরে দরজা খুলে আয়নার সমুখে দাঁড়ায়—ওটা একরকম তার মুদ্রাদোষ হয়ে গিয়েছে। রোদে আর পরিশ্রমে বিকালবেলায় স্থলপদ্মের

মতো মুখ তার ঈষৎ মলিন, চুলগুলো কপালের উপরে এসে পড়েছে। স্থলপদ্মের কথা মনে পড়তেই তার হাসি পায়; উপমাটা মিহিরের। হাসির সঙ্গে সঙ্গেই চোখের কোণ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, বাতাসে নাড়া-খাওয়া পাতার নীচে রৌদ্র-চিক্কণ শিশিরের ফোঁটা।

এসব তার ইস্কুল-মাষ্টারির প্রথম জীবনের কথা। তখনো তার মন শক্ত হয়নি, শুক্তির মধ্যেকার কাঁচা মুক্তাবিন্দুর মতো একটুতেই চঞ্চল হ'য়ে উঠতো। রাত্রে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কত রাত্রি পর্যন্ত না সে কেঁদেছে, এখন আর সহজে চোখে জল আসে না! এখন চোখের জল তুঃখের তাপে একেবারে দীর্ঘনিশ্বাসের বাষ্পাকারে বের হয়। এক সময়ে মধ্যরাত্রির অদৃশ্য প্রহরের জন্য যা সঞ্চিত ছিল এখন তা নিরন্তর বাষ্পাকারে উচ্ছ্বসিত—সময় অসময় নেই! পরিমিত চোখের জলের চেয়ে অপরিমিত দীর্ঘশ্বাস কি শ্রেয়ঃ, সুতপা বুঝতে পারে না।

প্রথম যখন সে এখানে এসেছিল, তখন তাকে নিয়ে কানা-কানি পড়ে গিয়েছিল, ছোট সহরে ছোট জলাশয়ের মতো একটু আঘাতেই তরঙ্গ-বলয় প্রসারিত হয়ে যায়। তাদের দোষ দিইনে। মাষ্টারণী নামে যে-সব মেয়ের সঙ্গে এরা পরিচিত তাদের চেহারা ও ধরণধারণই স্বতন্ত্র। কোণ-বহুল তাদের মুখমণ্ডল, শীর্ণ তাদের দেহ, তারা যেন সংসার-হর্তৃকির শুষ্ক বীচি; কেউ বা আবার এমন স্থূল যেন গঙ্গাস্নানের যাত্রীর আল্‌গা ক'রে বাঁধা বিসদৃশ বোচকা। তাদের কেউ বা প্রগল্‌ভ,

আর যারা নীরব তাদের যেন সমাধির স্তব্ধতা। তাদেরি বা দোষ কি? সংসারের ঘাটে ঘাটে ঠোক্কর খেতে খেতে তাদের সুডোল আকৃতি তুব্‌ড়ে তাব্‌ড়ে ওই একরকম হ'য়ে গিয়েছে।

সুতপা তাদের থেকে কত আলাদা!

কাঁচা তার বয়স, কচি তার মুখ, সৌন্দর্যের শুভ্র-শ্রীর উপরে বুদ্ধির চিক্কণতা সদ্যমথিত নবনীতের উপরে রৌদ্রের মতো গড়িয়ে পড়ছে; চুলগুলি খোঁপায় বদ্ধ, শাড়ী জামা যত কম দামেরই হোক না কেন তার স্পর্শে যেন একটা আভিজাত্য লাভ করে, ছোট্ট জুতো জোড়া দেখে ওর পায়ের লঘুসৌষ্ঠব অনুমান করতে দেরি হয় না। বেশি কথা কয় না অথচ লোকদেখানো নীরবতার ভাণও নেই, অত্যন্ত অপরিচিতের সঙ্গেও অনাড়ম্বর মহিমায় কথা বলতে পারে। আত্মসম্মান রক্ষার সপ্রয়াস বড়াই নেই—ও আপনিই রক্ষিত হয়। সুতপা যেন স্বচ্ছ স্ফটিক জলের উৎস—কত গভীর তা অনুমান করা সহজ নয়।

ইস্কুলের সেক্রেটারি বল্‌লেন,—তুমি একলা থাকবে?

সুতপা সহজভাবে বল্‌ল—আমি তো চিরকালই একলা, ও আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে।

সেক্রেটারি তাকে বাসা দেখিয়ে দিলেন, চন্দনী নামে ঝি-ও তাঁর স্থির ক'রে দেওয়া।

প্রথম প্রথম মিহির মাঝে মাঝে আস্‌তো। এমন স্থলে একটু কানাঘুষা হ'য়েই থাকে। লোকে ভাব্‌তো এ আবার কে? কিন্তু অপরকে যা মানায় না সুতপার পক্ষে তা যেন

অশোভন নয়। লোকের যে কানাকানি দাবাগ্নিতে পরিণত হ'তে পারতো সুতপার সযত্ন আঁচলের আড়াল তার নিয়ন্ত্রিত জ্যোতিকে গৃহদীপের পদবী দিল। লোকের রসনা ক্ষান্ত হ'ল—কিন্তু তার মনে কি শান্তি ছিল? সুতপা ভাব্‌তো মিহির কি চায়? সে কি ধরা দেবে না? মিহির মরীচিকার ফসল কেটে গোলা ভরতি করতে চায় নাকি? এমন ক'রে আর কতদিন চলবে? মিহির দু'একদিনের জন্যে আসে আবার চলে যায়—বহুদিন দেখা পাওয়া যায় না—আবার হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত।

আসলে সুতপা জানে না যে, পুরুষ দুই জাতের। এক জাতের পুরুষ আছে যারা মেয়েদের হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে চলে যায়, ধরা দেওয়া তাদের স্বভাব নয়; অন্য জাতের পুরুষ চাঁদের মতো পৃথিবীকে আবর্তন করে, ক্রমে তারা পৃথিবীরই এক দূরবিসর্পী অংশে পরিণত হয়, তাদের স্নিগ্ধ আলোক পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে। মিহির প্রথম জাতের পুরুষ। তার সঙ্কেতে নারীচিত্ত আলোড়িত হয়, মথিত হয়, কিন্তু না দেয় সে ধরা, না পারে সে ধরতে। এজন্য তাকে দোষ দেওয়া বৃথা। পূর্বরাগের দীপ্ত অসিকে বিবাহের বক্র খাপের ভিতরে ঢোকানো চলে না। কন্দর্প একবার মহাদেবের বিবাহের ঘটকালি করতে গিয়ে দগ্ধ হ'য়েছিলেন, সেই থেকে প্রজাপতির উপরে তাঁর চিরকালীন বিরক্তি! মিহির যে-দেবতার প্রজা তিনি প্রজাপতি নন, কন্দর্প।

সুতপার সবচেয়ে অসহ্য শীতের দীর্ঘ রাত্রিগুলো। ছোট

সহরে রাত্রির নিষুতি শীঘ্র আবির্ভূত হয়। রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া সেরে সে ঘরে ঢোকে—চন্দনী যায় তার বাড়ীতে চ'লে। তারপর থেকে তার সুদীর্ঘ নিশি উদ্‌যাপনের পালা। শীতের প্রহর বরফ-জমা নদীর মতো অচল; পাষাণের ভারে তা বুকের উপরে চেপে বসে। সুতপা আলোটা উস্কে দিয়ে মাথার কাছে টেনে নেয়—তার পরে লেপের ভিতরে ঢুকে পড়ে একখানা বই খোলে। ওই বই নিয়ে শোয়া তার এক মুদ্রাদোষ—বই সে পড়তে পারে না—তার মন অজানা চিন্তার ধারা বেয়ে ছুটে চল্‌তে থাকে। চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে ঘড়ির দিকে তাকায় কাঁটা দুটো কি চল্‌ছে? এত ধীরে কেন? দেয়ালে টিকটিকি ওৎ পেতে আছে, মাঠের মধ্যে শিয়াল ডেকে ডেকে ওঠে—হঠাৎ জানালার ফাঁকে চোখে পড়ে, রেল লাইনের পাশের গাছগুলোর মাথা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল—সাড়ে এগারোটার গাড়ীর সার্চলাইট। তারপরে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে—আলোটা জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায়। পরদিন চন্দনী এসে বলে—দিদিমণি কেরোসিন যে মেলে না—রাতে অত নাই পড়লে। এমনি প্রতি রাত্রে। শূন্যতার ভার যে এত দুর্বহ তা কি সুতপা আগে জান্‌তো।

তার জীবনযাত্রা যখন এমনিভাবে চলছিল—তখন সে এক সঙ্গিনী পেলো। রমা নামে একটি মেয়ে ইস্কুলের সেকেণ্ড টীচার হ'য়ে এলো। সুতপা হেড মিস্‌ট্রেস। ছোট জায়গায় অতিরিক্ত বাড়ী পাওয়া সম্ভব নয়। সুতপা রমাকে বল্‌ল,—তুমি আমার সঙ্গে থাকো না কেন? রমা রাজি হ'ল। সুতপা তাকে নিজের ড্রয়িং রুমটা ছেড়ে দিল। মিহির দু'একদিনের জন্য এসে

পড়লে রমা সুতপার ঘরে রাত কাটাতো। রমার সঙ্গ পেয়ে সুতপার শূন্যতার বোঝা কিছু হাল্কা হ'ল।

রমা সদ্য বি-এ পাশ ক'রে এসেছে—সুতপার চেয়ে প্রায় দশ বছরের ছোট।

মিহির মাঝে এসে একদিন কাটিয়ে গেলো।

রমা বলে—সুতপাদি, তুমি বিয়ে করো না কেন?

সুতপা শুধায়,—বিয়ে করবে কে আমাকে?

বর স্থির ক'রে তবে প্রস্তাব উত্থাপন করতে হবে এমন দায়িত্ব জানলে সে ওকথা কখনোই তুলতো না। তবু সে মনে মনে বলে,—কেন মিহিরবাবু তো আছেন। একবার দেখেই মিহির-সুতপার সম্বন্ধের একটা আঁচ রমা পেয়েছে। এসব জিনিস মেয়েদের চোখ প্রায়ই এড়ায় না।

সুতপা উল্টে প্রশ্ন করে,—তুমি বিয়ে না ক'রে চাকরি করতে এলে কেন?

রমা বলে,—চাকরি আর বিয়েতে তো আড়াআড়ি নেই। করবো।

তারপরে একটু ঝোঁক দিয়ে বলে,—সুতপাদি, আমার বিলেতে যাবার ইচ্ছে।

এবারে সুতপা না হেসে পারে না।

—বিলেতে যাবার সোজা পথ কি হ'ল বিহারের এই ইস্কুলের মাষ্টারি।

সে বলে,—রমা সত্যি যদি বিলেত যাবার ইচ্ছে থাকে—তবে

সে পথও হ'তে পারে বাসর ঘরের ভিতর দিয়ে, যদি তেমন তেমন বিয়ে হয়।

সুতপা বুঝ্তে পারে, রমা মেয়েটি মনে বয়সে অভিজ্ঞতায় একেবারেই কাঁচা। সংসারের পথ ঘাট সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার নেই। এই জাতের মেয়েরাই বিপদে পড়ে। যে-কোন পুরুষ দুটো মিষ্টি কথা বলে' ওদের বিভ্রান্ত করতে পারে। সে নিজে দুঃখের আগুনে পোড় খেয়ে অনেকটা শক্ত হ'য়েছে—কিন্তু রমাকে আগ্‌লে রাখতে না পারলে বিপদ আছে। সুতপার ঘাড়ে এক নূতন দায়িত্ববোধ চাপে।

মিহির এক মাসের মধ্যে দু'বার এলো। এত ঘন ঘন সে আসে না। সুতপা তাকে বল্‌ল,—তুমি এত ঘন ঘন এস না, লোকে নানারকম কথা বল্‌তে সুরু করেছে।

কথাটা সত্য নয়। সুতপার সম্বন্ধে কেউ কখনো কিছু বলেনি, বলা যে চলে তাও কারো মনে হয়নি।

তিন দিন ধরে রমার অসুখ, সে স্কুলে যায়নি। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে সুতপা দেখ্‌লো,—মিহির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেলে গেলো—এই সুযোগ বুঝেই কি মিহির এসেছে? কিন্তু জান্‌লো কি ক'রে? তবে কি রমা মিহিরকে চিঠি লেখে নাকি?

সুতপা মিহিরকে বল্‌লো,—আজ তোমাকে রাতে থাক্‌তে বলতে পারলাম না।

মিহির বললো—কেন?

—রমার অসুখ, তাকে ড্রয়িং রুম থেকে নড়ানো চল্‌বে না। তোমাকে থাক্‌তে দেবো কোথায় ?

মিহির সুতপাকে অবশ্যই চেনে—জানে তর্ক ক'রে তার মত পরিবর্তন সম্ভব নয়। মিহির বিদায় হ'য়ে গেলো। সুতপা লক্ষ্য করলো, মিহির চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রমার মুখ থেকে একটা আলো যেন নিভে গেলো।

রমা বল্‌ল,—সুতপাদি, তুমি মিহিরবাবুকে বিদায় করে দিলে কেন ? আমি তোমার ঘরেই শুতাম।

সুতপা বল্‌ল,—না।

যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলাহীন ওই মারাত্মক 'না' শব্দটিতে রমা বুঝ্‌তে পারলো মিহিরের ঘন ঘন যাওয়া-আসার সঙ্গে রমার উপস্থিতির একটা যোগ সুতপা যেন স্থাপন ক'রে নিয়েছে।

রমা মিহির-সচেতন হ'য়ে উঠল, তারপর থেকে তেমন অনায়াসে আর সে মিহিরের প্রসঙ্গ তুল্‌তে পারতো না।

সুতপার জীবনের শূন্যতার বসনের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ঈর্ষার, অতি সূক্ষ্ম আত্মগ্লানির দুটি সূতোর টানা-পোড়েন ক্রমে যুক্ত হ'য়ে যায়। এসব এমন কথা যার প্রমাণ নাই, অনুমানও বলা চলে না ; এ যেন নিজেরই ছায়ায় নিজের ভীত হ'য়ে ওঠা। অপরের উপরে দোষ দিতে পারলে যে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, সে সান্ত্বনা-টুকুও নেই এর মধ্যে। মিহির চিঠি লিখলো একবার আস্‌তে চায়। সুতপা লিখে দিল —এখন আসবার প্রয়োজন নেই।

মিহির যে তাকে বিবাহ করবে—এ আশা তার অনেক দিন

চলে গিয়েছিল। সে হচ্ছে গিয়ে দুঃখ। আর মিহিরের সঙ্গে রমার যোগাযোগ—সত্যি কি তাই? খুব সম্ভব সেটা কেবল সুতপার অনুমান মাত্র, প্রমাণই হোক্ বা অনুমানই হোক্, সুতপার কাছে তা সত্য। ঈর্ষার সত্য, আত্মগ্লানির সত্য। সেই সত্য তাকে নিরন্তর পীড়িত করতে লাগ্‌লো। এ হচ্ছে দুশ্চিন্তা। দুঃখের অন্ত আছে, দুশ্চিন্তার অন্ত কোথায়? এই নূতন দুশ্চিন্তায় সুতপার শরীর ও মন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে লাগ্‌লো। দিনের কাজ বিস্বাদ, রাত্রের নিদ্রা বিষাক্ত, রমার সঙ্গ কাঁটার মতো সূচী-মুখ। কিন্তু তার সব চেয়ে ভয়াবহ সময় রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহর-গুলো। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হ'য়ে তাকে নিদ্রাকর ঔষধের সাহায্য নিতে হ'ল—আফিঙের আরক-দেওয়া ঘুমের ওষুধ।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ একটা কোলাহলে তার ঘুম ভেঙে গেল। জান্‌লা খুলে দেখ্‌ল—তুমুল রবে বাজনা বাজিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে একটা শোভাযাত্রা চলেছে, বিয়ের শোভাযাত্রা। একটা খোলা ঘোড়ার গাড়ীতে বর-কনে বিয়ে ক'রে বাড়ীতে ফিরছে। সে মূঢ়ের মতো সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শোভাযাত্রা চলে যাওয়ার পরে সমস্ত জায়গাটা গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। সুতপা জানালা বন্ধ ক'রে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণার্ত পথিক নদীর স্বচ্ছ শীতলধারা দেখ্‌তে পেয়েছে!

সুতপা স্থির করলো সে বিবাহ করবে। মিহির যদি সম্মত না হয়—তবে অন্যত্র সে বিবাহ করে ফেল্‌বে। এমন ক'রে দুশ্চিন্তার জাল টেনে আর চলা যায় না। এই সঙ্কল্প করবামাত্র

কেমন একটা স্বস্তি বোধ করলো, সে ঘুমিয়ে পড়লো—এমন আরামের নিদ্রা অনেক দিন তার ভাগ্যে জোটেনি।

এদিকে রমার মধ্যেও কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। কিছুদিন থেকে শরীর তার সুস্থ যাচ্ছে না—কিন্তু তাই বলে মনের আনন্দের কিছু অভাব নেই। শীতের রাতের সমস্ত শিশির বিন্দু গড়িয়ে এসে অশত্থ-পাতার আগটিতে যেমন তুল্‌তে থাকে তার সমগ্র মনটি যেন মুখমণ্ডলে এসে সঞ্চিত হ'য়েছে, প্রতি নিশ্বাসে তা কেঁপে ওঠে। সুতপা ও তার মধ্যে ব্যবহারের যে-আন্তরিকতা আগে ছিল এখন তা আর নেই—ভদ্রতাটুকু অবশ্য আছে। তুপুর বেলা চিঠির গোছা এলেই তার মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—সুতপার চোখ তা এড়ায় না, সুতপার চোখ এড়ায়নি এই লজ্জা তাকে দ্বিগুণ লজ্জিত ক'রে তোলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের এই যে, এই সমস্ত লজ্জা, উদ্বেগ, চঞ্চলতা সমস্তর সমষ্টি কিন্তু তুঃখ নয়—কেমন এক রকমের তীব্র উন্মাদনা! অভিজ্ঞতাটা রমার মন্দ লাগে না।

গাড়ীর সময় হলেই রমা আর কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পারে না—সুতপা লক্ষ্য করে। বাড়ীর বাইরে কারো পায়ের শব্দ শুনলেই তার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মাথা-কোটা উগ্রতর হয়ে ওঠে—নিজের স্পন্দনে সুতপা রমার স্পন্দন বোঝে; সুতপার হৃৎপিণ্ড বলে, যেন সে না আসে, যেন সে না আসে, আর রমার তালে তালে বাজতে থাকে, আসুক, আসুক, আসুক। রাত্রে পাশাপাশি তুই ঘরে তুইজন শুয়ে থাকে—তুইজনের চিন্তা একই নদীর তুই বিপরীত কূল বেয়ে তুই বিপরীত দিকে

গুণ টেনে চলে। আজ দুইজনেই সমান দুঃখী—তবে রমার দুঃখের পাড় দু'খানা উজ্জ্বল, সুতপার দুঃখ নিশ্ছিদ্র।

মিহির অনেকদিন আসেনি। সে রাত্রের অভিজ্ঞতা অনুসারে কাজ করবার জন্যে তার একবার কল্‌কাতায় যাওয়া দরকার। সুতপা ছুটির দরখাস্ত করল। ছুটি অবশ্যই তার মিললো, কিন্তু সবাই বিস্মিত হ'য়ে গেলো—এ আবার কেমন? যে সুতপা ছুটিতে অবধি ছুটি নেয় না,—এখানেই থাকে, তার হঠাৎ এমন কি প্রয়োজন পড়লো!

রমা শুধালো—সুতপাদি, তুমি ছুটি নিচ্ছ?

সুতপা বল্‌ল—তোমরা পাড়া শুদ্ধ সবাই এমন অবাক হ'য়ে গেলে কেন? আমার কি কোন কাজ পড়তে নেই।

রমা বলল—তা কেন? তবে আমি এসে তোমাকে ছুটি নিতে দেখিনি—তাই একটু অবাক লাগছে।

রমার অবাক হওয়া উচিত নয়—তার আসার সঙ্গে সুতপার ছুটি নেওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন যোগ আছে।

রমা আবার শুধালো—কবে যাবে?

সুতপা একটা শনিবারের উল্লেখ করলো—তখনো তার দশ দিন দেরী।

ইতিমধ্যে সুতপা মিহিরকে খান দুই তিন চিঠি লিখেছে, উত্তর পায়নি। মন দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যেতো—সুতপার মধ্যে কোথায় যেন একটা পরিবর্তন হ'য়ে গিয়েছে। মুখখানা তেমনি সুন্দর আছে—কিন্তু তার উপরে কেমন যেন

একটা স্থির সঙ্কল্পের অস্বাভাবিক দীপ্তি, খোলা তলোয়ারের শাণিত উজ্জ্বলতার মতো !

আজ শনিবার। সুতপার ছুটির দিন। রাত্রের ট্রেণে তার কল্‌কাতা যাত্রার কথা। ইস্কুল থেকে সে একটু আগেই বাসায় ফিরে এল, গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে—রমাকে বাড়ী-ঘর বুঝিয়ে দিতে হবে—অনেক কাজ বাকি। টেবিলের উপর ছিল একখানা খামের চিঠি, অন্য দিনের মতো স্থিরতা তার থাকলে ঠিকানা দেখে তবে সে খুলতো। চিঠিখানা খুলে ফেলেও তার বিস্ময়ের কোন কারণ হ'ল না। মিহিরের চিঠি। তবে সে এতদিন পরে উত্তর দিয়েছে। মিহির লিখছে যে, সে শনিবার শেষ রাতে যাবে, সে যেন তৈরি থাকে, দু'জনে রওনা হবে জব্বলপুরের দিকে। বিশেষ ক'রে শনিবার স্থির করবার কারণস্বরূপ লিখেছে যে, সেদিন মাঝরাতের ট্রেণে সুতপা কলকাতা চলে যাবে কাজেই এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। হঠাৎ নিজের নামটা পড়ে সে চমকে উঠ্‌ল—এ চিঠি তবে কা'কে লেখা ? উপরে রমার নাম ! তবে সে না জেনে রমার চিঠি খুলে ফেলেছে। কিন্তু ঠিকানাতো মিহিরের হস্তাক্ষর নয় ! দুঃখের নূতন জগৎ আবিষ্কারের বিস্ময়ে বসে পড়লো ! তবে যা অনুমান করেছিল তা মিথ্যা নয়। অনুমান ? এইতো প্রমাণ তার হাতে। দেহের বীভৎস ক্ষতস্থানের দিকে চাইতে যেমন ভয় করে—অথচ না তাকিয়েও থাকতে পারা যায় না—চিঠিখানা নিয়ে সুতপার তেমনি অবস্থা ! খানিকটা পড়ে আবার থামে। বটে ! দু'জনে পালানোর ব্যবস্থা অনেকদিন

থেকেই স্থির—"পাছে তুমি দিনক্ষণ ভুলে যাও, তাই আজ আবার মনে করিয়ে দিলাম।" তা'হলে রমাও তৈরি ওর সঙ্গে পালিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু কই তার মুখ-চোখ দেখে তো সুতপা বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারা উচিত ছিল! রমাকে যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন নয় দেখ্ছি, বেশ চাপা মেয়ে। চিঠিখানা নিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে সে শুয়ে পড়লো, দরজা দিতে ভুললো না। চিঠিখানা পড়তে পড়তে সে এক রকম হিংস্র-উল্লাস অনুভব করতে লাগলো। এই একখানা চিঠির আঘাতে সে রমা ও মিহির ছু'জনকেই ধরাশায়ী করতে পারে। মাত্র ছু'জন? সব চেয়ে বেশী আঘাত যে পেয়েছে তার নাম কি সুতপা রায় নয়? "আমি পিছনের দিকের প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবো—তুমি তোমার ঘরের সম্মুখের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে বেরুবে পিছনের দরজা দিয়ে—উঠোনের দিকে। ঘড়িতে চারটার এলার্ম দিয়ে রেখো।" ওঃ, ক্যাম্পেনের প্ল্যানে কোথাও খুঁৎ নেই যে! মিহির লিখছে, তার পরে ছু'জনে পালিয়ে যাবে জব্বলপুরে—সম্মুখে অনন্ত পৃথিবী, অবাধ আকাশ। সুতপার মনে হ'ল—ইস্—একেবারে রোমিও জুলিয়েট আর কি! তার মনের মধ্যে শত-সহস্র স্বতোবিরুদ্ধতার স্রোত প্রবল আবর্ত সৃষ্টি করে পাক খেতে লাগ্ল। কিন্তু রোমিওর আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল—এমন গোপনীয় কথা এরকমভাবে চিঠিতে লেখা উচিত হয়নি। এই দেখনা কেন আমার হাতে পড়ে গেল! এখন যে ইচ্ছা করলে তোমাদের সব প্ল্যান মাটি করে দিতে পারি! তবে অনেকদিন থেকে ছু'জনে চিঠি-পত্র চলছে।

রমার ক্লাসে একটি ছোট ছেলে পড়তো তার নাম মিহির। এখন সুতপার মনে পড়লো সেই নামটি ধরে ডাকবার সময়ে রমার গলা এমন কাঁপতো কেন? নাঃ মিহিরটা এমন নীচ? আর রমাই বা কি সাধু? যাই বলো এমন ডুবে-ডুবে জলখাওয়া মেয়ে দেখতে পারিনে। কিন্তু এমন লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল? খোলাখুলি সকলকে বলে ক'য়ে কি তারা যেতে পারতো না? ঠেকাতো কে? তখনি আবার তার মনে পড়্‌ল—এমন গোপনীয়তার পথ বিচারের পথ নয়। সে স্পষ্ট রমার সর্বনাশ চোখের উপরে দেখতে পেলো। তখনি তার মনে হ'ল রমাকে এই সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে হবে। আর মিহিরের প্রতিও কি তার কোন দায়িত্ব নেই? মিহির যে অন্যায় করতে যাচ্ছে—তার পথে বাধা রচনা করাই কি সুতপার কর্তব্য নয়? সুতপা যদি প্রকৃতিস্থ বুদ্ধিতে নিজের মনটাকে বিশ্লেষণ করতো তবে দেখতে পেতো রমা বা মিহির কারো প্রতি কর্তব্যেই সে উদ্বুদ্ধ হয়নি। দারুণ ঈর্ষায় তার মন আলোড়িত হচ্ছে। কিন্তু নিজের দুর্বলতা সে স্বীকার করবে কেন? তাই কর্তব্যবুদ্ধির খাতে নিজের ঈর্ষাকে প্রবাহিত ক'রে দিয়ে সে এক প্রকার আত্মপ্রসাদের স্বাদ অনুভব করলো। নিজের ঈর্ষাকে স্বীকার করলে সে খাটো হয়ে পড়ত—অপরের প্রতি কর্তব্যের দায়িত্বে নিজেকে হঠাৎ মহৎ বলে মনে হ'ল। কিন্তু রমাকে বাঁচাবার উপায় কি? তাকে সব কথা খুলে বলবে? সুতপার তখনো এটুকু প্রকৃতিস্থতা ছিল যাতে সে বুঝতে পারলো এসব কথা এমন সময়ে এমন ভাবে খুলে বল্‌লে—কেউ বোঝে না, বুঝতে চায় না,

বুঝতে পারে না। তাতে কোন ফল হবে না—বরঞ্চ উল্টো ফল হবে।

কিন্তু যেমন করেই হোক রমাকে বাঁচাতে হবে, তাতে মিহিরকেও বাঁচানো হবে। তখন অপর কেউ সুতপাকে দেখলে ভাবতো সে নিশ্চয় পাগল হবার মুখে। তার হাতের আঙ্গুল-গুলো বারম্বার চঞ্চল হ'য়ে উঠছে—যেন অদৃশ্য কোন একটা বস্তুকে নিষ্পেষণ করেছ, চোখ হ'য়ে উঠেছে লাল, কপালের শিরা প্রহত তন্ত্রীর মতো লাফাচ্ছে, চুল এলোমেলো, বক্ষের বিস্ফারণ-সঙ্কোচনে ব্লাউসটা কম্পিত। ভাগ্যিস্ বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না—না চন্দনী, না রমা।

এমন সময়ে চন্দনী এসে ডাকলো, দিদিমণি ওঠো, জিনিস-পত্র গোছাতে হবেনি!

সুতপা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে চিঠিখানা বুকের ভিতর জামার ফাঁকে রাখলো এবং মুখে চোখে জল দিয়ে চেহারায় অনেকটা সুস্থভাব আনলো।

চন্দনী ঘরে ঢুকে অবাক্ হ'য়ে গেল—একি দিদিমণি এখনো তোমার জিনিসপত্র গোছানো হয়নি।

সুতপা বলল—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এখনি গুছিয়ে নিচ্ছি।

রমা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে সুতপার জিনিষপত্র গোছানোতে সাহায্য করতে লেগে গেল। সুতপা স্থির করেছিল যে, এখন আর আলোড়নের পাকে নিজেকে ক্ষুব্ধ করবে না। তার সঙ্কল্প স্থির হ'য়ে গিয়েছে। সমস্ত সঙ্কল্পের মধ্যেই একটা শান্ত মহিমা

আছে—সেই শাস্তি তাকে ধৃতি দিয়েছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, হ্যাঁ, জিনিসপত্র সঙ্গে নিতেই হবে, সুতপা যাত্রার আয়োজন স্থির করে ফেল্‌ল। কিন্তু রওনা হ'বার এখনো অনেক দেরি—রাত দশটায় গাড়ি।

রমা শুধালো—সুতপাদি, কবে ফিরবে?

সুতপা বল্‌ল—বেশি দেরি হবে না। মনে মনে সে হাসলো—রমা জানে না যে, তার সমস্ত প্ল্যান সুতপার হাতের মুঠোর মধ্যে।

রাত্রের আহার সেরে নিয়ে, সুতপা আর একবার মনে মনে হাসলো, এত দুঃখের মধ্যেও তাকে আহারের ভান করতে হল! বিছানা সুটকেস একটা মুটের মাথায় চাপিয়ে সে ষ্টেশনে যাত্রা করলো। রমা সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, সুতপা তাকে সঙ্গে নিল না। বাড়ির সমুখের দরজা বন্ধ ছিল। খিড়কি দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। খিড়কির একটা চাবি চন্দনীর কাছে থাকে, সে আসে খুব ভোর বেলা, আর একটা চাবি থাকৃতো সুতপার কাছে।

সুতপা যখন ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল—তখনো গাড়ির অনেক দেরি। সে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে বিছানা রেখে একখানা আরাম কেদারায় গিয়ে বস্‌ল, টিকিট কিনবার কোন তাগিদই অনুভব করল না। সেই নির্জন ওয়েটিং রুমে আবার সে নিজের অবস্থা ভাববার অবসর পেলো। বাইরে জনতার কোলাহল, গাড়ির শব্দ, লাল নীল আলো, সমস্তই যেন আর এক জগতের ব্যাপার। যে-নৌকো ডুবতে বসেছে তীরের চিহ্ন

তার কাছে মরীচিকা ছাড়া আর কি। অনেকক্ষণ বসে থেকে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় আকাশ ও পৃথিবী রহস্যময়। সে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে নীচে নেমে রাস্তা ধরে চল্‌তে সুরু করল। কিছুক্ষণ চলবার পরে ষ্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে একটা শাল বনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। একদিকে এই শাল বন, ওপারে শহর, যে শহরের মধ্যে তার বাড়ি—মাঝখানে রেলপথ।

বনের মধ্যে একটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে সুতপা বস্‌লো। মাটিতে গাছের ছায়া পড়েছে—কালো কালো ধ্বসে পড়া স্তম্ভশ্রেণীর মতো, কার কল্পনার ইন্দ্রপ্রস্থপুরী যেন ভূমিকম্পে ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে ধূলোয় লুটোচ্ছে, সেই ধ্বংসাবশেষের মায়ার মধ্যে বিমূঢ়ের মতো সুতপা বসে রইলো। শালের ফুল সবে ফুটতে সুরু করেছে—ক্ষীণ জ্যোৎস্নার সঙ্গে সেই ক্ষীণ সুগন্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত, চোখের জ্যোৎস্না আর ঘ্রাণের সৌরভ একেবারে এক হ'য়ে গিয়েছে; অবিরাম ঝিল্লির তালে তালে জোনাকিগুলো চমকাচ্ছে; হাওয়ায় শুকনো পাতা শিরশির করে নড়ছে, আর নিস্তব্ধতার আঁচলে বেষ্টিত সুতপা নিস্তব্ধ।

সুতপার মনে পড়লো ছেলেবেলায় তার মা সুতপা নামের ব্যাখ্যা করে বল্‌তেন—মেয়ে আমার আর জন্মে উমার মতো অনেক তপস্যা করেছিল, তাই নাম পেয়েছে সুতপা, এজন্মে বর পাবে মহাদেবের মতো। তার মনে হ'ল—মা থাকলে দেখতো তার কথাই সত্যি হ'তে চলেছে—সে মৃত্যুঞ্জয়কে ছাড়া আর কাউকে বরণ করবে না। একবার তার বিস্ময় বোধ হল—এই

কি তার জীবনের শেষ রাত্রি! আর একটু পরেই কি তার অস্তিত্ব থাকবে না? তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কি ছায়ার প্রাসাদের মতোই ধূলোয় লুটোবে না? যে প্রাণ-স্ফুলিঙ্গ মির্মিরিত হচ্ছে ওই জোনাকি-জালের মতো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ওই জোনাকিগুলোর চেয়েও মিথ্যা হয়ে যাবে! জলমগ্নের অন্তিম দৃষ্টিতে পৃথিবী যেমন সুন্দর দেখায় তেমনি সুন্দর মনে হ'ল পৃথিবীকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে কেমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব শান্তি অনুভব করলো। তখনি তার মনে হ'ল—মৃত্যুর উপকূলের এই শান্তি কি সেখানে আরও গভীর হয়নি।

হঠাৎ তার মনে হ'ল রাত্রি নিশ্চয় অনেক হয়েছে, বাতাস বেশ শীতল। সে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়লো। সে আর ষ্টেশনের দিকে গেল না—রেল লাইন পার হ'য়ে সোজা বাড়ির দিকে চল্‌ল। চারিদিক নির্জন, কল্‌কাতাগামী ট্রেণ অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে। পথে লোক নেই, একটা কুকুর একবার ডেকে উঠে থেমে গেল, অদূরে রেলের ভারি আলো হাতে একটা লোক চলে গেল—আলোর গোলাকার দাগ পড়লো মাটিতে, বাতাসে টেলিগ্রাফের তারের শনশনানি, খটাৎ ক'রে শব্দ হ'য়ে সিগন্যালে আলোর রং বদলালো, অন্ধকারের লেবু ফুলের করুণ গন্ধ, চাঁদ প্রায় ডুবলো বলে'।

সুতপা এসে দাঁড়ালো তার বাড়ির খিড়কি দরজার সমুখে। কান পেতে শুনলো সাড়া শব্দ নেই। একবার পৃথিবী আর আকাশের দিকে তাকিয়ে নিয়ে খট্ করে তালা খুলে ভিতরে

ঢুকলো, তারপরে দরজা দিল বন্ধ করে। তখন চাঁদ অস্ত গিয়েছে।

রমার এলার্ম ঘড়ি বেজে উঠল। রমা লাফিয়ে উঠে দেখে রাত্রি চারটা। হঠাৎ তার মনে পড়ল না, কেন এই জাগরণ। তারপরে ধীরে ধীরে যেন তার সব কথা মনে পড়তে লাগলো। সব তার গোছানোই ছিল—ছোটো একটা ব্যাগের ভিতরে টুকি-টাকি পূরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একবার তপ্তশয্যা, বহুদিনের ঘরটির দিকে তাকিয়ে তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলো—তখনো পূব আকাশে রঙ ধরেনি।

পা টিপে টিপে এসে সে দরজার খিল খুলে ফেলে ধাক্কা দিল, কিন্তু দরজা খুল্‌লো না। ঘুমের চোখে ছিটকিনি খুল্‌তে ভুলে গিয়েছে ভেবে খোলা ছিটকিনি আবার খুল্‌ল। আবার দরজায় ধাক্কা দিল—কিন্তু তবু দরজা খুল্‌ল না। এ আবার কি? ওদিক থেকে তবে কেউ কি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে? তার মনে পড়লো কাল নিজে সে স্নুতপা ও চন্দনীকে বার ক'রে দিয়ে খিড়কি এঁটে দিয়েছে। তবে? আবার দরজায় ধাক্কা দিল। মনে হ'ল বাইরে থেকে কেউ যেন দরজা চেপে বসে রয়েছে। কে? তার শরীর কেঁপে উঠল। তার মিলনের অব্যবহিত এই মুহূর্তে বাধা এলো কোন্ সূত্র ধরে? নানা আশঙ্কায় তার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। তার মনে পড়লো মিহির অপেক্ষা করছে ষ্টেশনের পথে—ভোরের আলো হবার আগেই ট্রেণে উঠতে হবে। এবারে সে প্রাণপণে ঠেলা দিল—দরজা ঈষৎ ফাঁক হ'ল। যাক্, তবে বাইরে থেকে কেউ দরজা বন্ধ করেনি, সে খানিকটা স্বস্তি অনুভব

করলো। দরজা একটু ফাঁক হ'ল কিন্তু না খোলার কারণ বুঝতে পারা গেল না—বাইরে অন্ধকার। রমা টর্চের আলো ফেল্‌ল—কালো কালো ওকি? কোন রকমে আঙুল চালিয়ে অনুভব করলো—মানুষের চুল নাকি? না তা অসম্ভব। কিন্তু দরজা তো আর খোলে না। মনে হ'ল—কি যেন, কে যেন দরজা চেপে বসে রয়েছে। কি? কে? কেন? কিন্তু ভোর হ'বার আর বিলম্ব নেই—যেমন করেই হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সে মূঢ়ের মতো দরজা ঠেলাঠেলি করতে লাগলো—চুল খুলে গেল, কাপড় শিথিল হলো—কপাল থেকে তার ঘাম ঝর্‌তে আরম্ভ করল।

অনেক ঠেলাঠেলির পরে দরজা ছু'চার ইঞ্চি ফাঁক হ'ল—তখন আকাশেও একটু আলো হয়েছে। রমার মনে হ'ল কে যেন প্রাণপণ শক্তিতে দরজা ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে। তার কম্পিত কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন হ'ল—কে? নিজের বিকৃত স্বরে সে নিজেই চম্‌কে উঠল।—কে? উত্তর নেই। এবারে টর্চ ফেলতেই তার চোখে পড়লো শাড়ীর পাড়। পরিচিত শাড়ী। সুতপার শাড়ীর পাড়।—তবে কি সুতপাদি সব জানতে পেরেছে? রমা সুতপার নাম ধরে ডাক্‌লো—কোন সাড়া নেই। এবারে ভালো ক'রে আলো ফেলতেই দেখতে পেলো সেই নারী মূর্তির ডান হাতে একখানা চিঠি, পাশে গড়াচ্ছে একটা ওষুধের শিশি। রমা মরিয়া হ'য়ে উঠেছে—এবারে ধাক্কা দিতে দরজার একখানা পাল্লা খুলে যেতেই একটি অসাড় নারীদেহ মাটিতে পড়ে গেল—রমা দেখল—সুতপার প্রাণহীন দেহ।

রমা একটা অর্ধস্ফুট শব্দ করে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে গেল। চৌকাঠের ছ'দিকে ছুই নারীদেহ লম্বিত, মৃতপ্রায় ও মৃত।

সুতপার সঙ্কল্প সার্থকতায় পৌঁছেছে, দুর্গতির হাত থেকে রমাকে রক্ষা করবার জন্যে সর্বনাশের দ্বার রুদ্ধ ক'রে সে আত্ম-বিসর্জন করেছে। রমা ও মিহিরকে সে বাঁচিয়েছে—কিন্তু নিজে বাঁচলো কি?

রত্নাকর

অতর্কিতে অকস্মাৎ সৌন্দর্য সরস্বতীর বাণাহত হইয়া নিরঞ্জন আবিষ্কার করিল প্রতিমা অপরূপ সুন্দরী। তাহার দৃষ্টিতে প্রতিমা অকস্মাৎ সৌন্দর্যের আদি-কবিতার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ এমন হইতে গেল কেন? রত্নাকরের জীবনেই বা এমন হঠাৎ কাণ্ড কেন ঘটিয়াছিল? রত্নাকর কি তৎপূর্বে জীবহত্যা দেখে নাই? নিরঞ্জনও বহু নারী দেখিয়াছে, তাহাদের অনেকেই সুন্দরী, কিন্তু সে সৌন্দর্য তাহার চোখে ধরা পড়ে নাই। তবে আজ অকস্মাৎ কেন সে প্রতিমাকে সুন্দরী বলিয়া আবিষ্কার করিল জানি না। বোধ করি আবিষ্কারে ও অকস্মাতে কোথাও একটা নিগূঢ় যোগাযোগ আছে, বোধ করি আকস্মিক-তাই আবিষ্কারের প্রাণ। বোধ করি সৌন্দর্য ও মানবহৃদয় একটা শুভদৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে। রত্নাকরের শুভদৃষ্টি ঘটিয়াছিল তমসা নদীর তীরে, আর নিরঞ্জনের ঘটিল হাওড়া ষ্টেশনের সাত নং প্ল্যাটফর্মে। দুইয়ে কত প্রভেদ—তবু কত মিল।

নিরঞ্জন ও প্রতিমা পাশাপাশি বাড়ির ছেলেমেয়ে এবং দুইজনে সজ্ঞানে পরস্পরকে পনেরো বৎসরের বেশী দেখিয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নিরঞ্জনের চোখে প্রতিমাকে কখনো সুন্দর বলিয়া মনে হয় নাই। সে প্রতিমাকে হাসিতে দেখিয়াছে, কাঁদিতে দেখিয়াছে, খেলিতে দেখিয়াছে, পড়িতে

দেখিয়াছে, তাহাকে বাড়িতে দেখিয়াছে, ইস্কুলে দেখিয়াছে, সিনেমা এবং থিয়েটার অনেক স্থানেই দেখিয়াছে ; কিন্তু কখনো তাহাকে সুন্দরী বলিয়া মনে হয় নাই। তাহাকে ফ্রক-পরা অবস্থার এলিজাবেথীয় যুগ হইতে জর্জেট শাড়ী পরার জর্জীয় যুগ অবধি নানা অবস্থায় দেখিয়াছে কিন্তু প্রতিমা যে সুন্দরী তাহাতো কখনো তাহার মনে হয় নাই। বরঞ্চ তাহার ঈষৎ উন্নাসিক নাসা ও সিকি-ভগ্ন দাঁতটি লইয়া তাহাকে কতবার ঠাট্টা করিয়াছে। সে ঠাট্টায় প্রতিমা প্রথমে হাসিয়াছে, কিন্তু ঠাট্টা মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়াতে যখন তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতে সুরু করিয়াছে, তখন নিরঞ্জনের মনে হইয়াছে চোখ ছু'টিও ত্রুটিশূন্য নয়—আর একটু টানা-টানা হইলে যেন দেখাইত ভালো। সেই প্রতিমা সুন্দরী। আর এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের স্থান কি না হাওড়া ষ্টেশন। হাওড়া ষ্টেশনের সাত নং প্ল্যাটফর্ম যে সৌন্দর্য লক্ষ্মীর পীঠস্থান এমন তো কোন শাস্ত্রে লেখে না। দিল্লী মেলের সেকেণ্ড ক্লাস কামরা যে এমন করিয়া কালিদাসের তুলিবুলানো তাহা কে জানিত। এই প্রতিমাকে তো নিরঞ্জন সে বারে গিরিডির উস্রী প্রপাতের পাথরছড়ানো তীরে চড়ি ভাতি রন্ধনে নিরত দেখিয়াছিল ? কিন্তু তখন তো তাহাকে সুন্দরী মনে হয় নাই, বরঞ্চ আগুনের তাপে নাকের ডগাটি ঈষৎ রক্তিম হইয়া ওঠাতে উন্নাসিকতা আরও উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আবার আর একদিন তাহাকে দেখিয়াছিল, আজও মনে পড়ে, কলিকাতার বাহিরে বিহারের আর একটি ছোট শহরে, কালবৈশাখীর

বিদ্যুদ্দাম-বিশোভিত বর্ষণোন্মুখ আকাশের নীচে। সৌন্দর্য আবিষ্কারের সেইতো ছিল প্রশস্ত স্থান। শেষে কি না সৌন্দর্য ধরা পড়িল করোগেট টিনের ছাদের নীচে রেল গাড়ীর লোহার কামরায়? কিন্তু রত্নাকরের বাণী মূর্তিও তো আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন কালো তমসার তীরে। তখনো তো সরস্বতী নদী মরুভূমিতে আত্মগোপন করে নাই। কুৎসিতের আসনেই সুন্দরের আবির্ভাব। লক্ষ্মীর বাহন পেচক।

নিরঞ্জনের এই অভিনব অনুষ্টুপমূর্তি দর্শনের পূর্ব ইতিহাস কি? রত্নাকরের পূর্ব জীবন না জানিলে তাহার ছন্দোলাভের গুরুত্ব বুঝিতে পারা সম্ভব নয়।

নিরঞ্জন ও প্রতিমাদের বাড়ি পাশাপাশি। দুই পরিবারের চেনা-শোনা তাহাদের দু'জনের জীবন ধারাতেও সংক্রামিত। প্রতিবেশী মাত্র বলিয়া তাহাদের পরিচয় দিলে মিথ্যা হয়, আবার আত্মীয় বলিলেও সত্য হয় না—সম্বন্ধটা এই রকমের। দু'জনকে খেলার সাথী বলা চলিত, যদি না নিরঞ্জন প্রতিমার কয়েক বছরের বড় হইত। প্রতিমা তাহাকে নিরঞ্জনদা বলে বটে, কিন্তু অদৃষ্টের পাশার আঘাতে ওই সম্বোধনটা উল্টিয়া যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু অদৃষ্টের ও সম্বন্ধের এত সব সূক্ষ্ম রহস্য তাহাদের কখনো মনে উদিত হয় নাই, তাহাদের কাহিনী রচয়িতাকেই এই সব জটিল জাল এড়াইয়া পথ করিতে হইতেছে।

তাহারা দু'জনে দুই ইস্কুলের পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের পাঠ্যজীবনের মধ্যযুগের শেষে যখন পুনরায় যবনিকা

উঠিল, দেখা গেল প্রতিমা সংস্কৃত শাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছে, আর তাহার কয়েক বছর আগে ফুটবল খেলার গৌরবে নিরঞ্জন মোটা মাহিনায় এক রেল কোম্পানীর চাকুরীতে অধিষ্ঠিত। বি-এ পাশ করিবার কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিমা বিহারের একটি ইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ পাইল।

আজ প্রতিমার কর্মস্থলে যাত্রার দিন। তাহার মাতা নিরঞ্জনকে বলিলেন—বাবা তুমি যদি গিয়ে মেয়েটাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসো।

নিরঞ্জন বলিল—মাসিমা, আজ যে আমার খেলা আছে। এ খেলা খেলা নয় মাসিমা, চাকুরী ; অনুপস্থিত হ'লে বড় সাহেব যা বল্‌বে তা মাসির সম্মুখে উচ্চারণ করবার মতো নয়।

তারপরে সে প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিল—শনিবারে রওনা হও না কেন, আমি সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

মাতা একবার মেয়ের দিকে তাকাইলেন, মেয়ে বলিল—কাল join করবার তারিখ—আজই রওনা হ'তে হবে।

মাতা ঘুরিয়া নিরঞ্জনের দিকে তাকাইলেন। নিরঞ্জন অদৃশ্য বড় সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিল—বড়ই মুস্কিল।

প্রতিমা বলিল—মুস্কিল আবার কি। আমি একাই যেতে পারবো।

তাহাই স্থির হইল। সে পাড়ার অন্য কাহাকেও সহায় করিয়া ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীতে উঠিবে। নিরঞ্জনের মুখ দেখিয়া মনে হইল যে, বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে বিপর্যস্ত করিয়া নিজের সুনাম রক্ষা করিবার আজ তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

বিখ্যাত খেলোয়াড় নিরঞ্জন তিনটা অফসাইড গোল ও দুইটি সেম-সাইড গোল দিয়া যখন বাসায় ফিরিল তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। প্রতিমাদের বাড়িতে ঢুকিয়া সে শুধাইল—মাসিমা, প্রতিমা রওনা হ'য়ে গিয়েছে ?

প্রতিমার মা বলিলেন—এই যে বাবা এসেছ। বড় ভালো হ'য়েছে। মেয়েটা সাত তাড়াতাড়িতে এই ব্যাগটা ফেলে গিয়েছে—যদি ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এসো।

ব্যাগ লইয়া নিরঞ্জন ষ্টেশনে ছুটিল। এই সময়ে প্রতিপক্ষের গোলকিপার তাহার সম্মুখে পড়িলে, আর শুধু গোলকিপার কেন, সে একাই এখন বিপক্ষের একাদশ অক্ষৌহিণীর মোহাড়া লইতে পারে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ভাবিতে ভাবিতে, খুঁজিতে খুঁজিতে এবং মনে মনে বড় সাহেবের পিত্রন্ত করিতে করিতে নিরঞ্জন আসন্নযাত্রা দিল্লী মেলের একটি সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় প্রতিমাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। নিরঞ্জন জানলা দিয়া ব্যাগটা গলাইয়া দিয়া বলিল—এই নাও ব্যাগ। তারপরে নিজেও ঢুকিল। যে লোকটি তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল, সে চলিয়া যাইবার পরে প্রতিমা আবিষ্কার করিয়াছিল যে, ব্যাগটা ফেলিয়া আসিয়াছে। প্রথম বিদেশ যাত্রার শঙ্কার সঙ্গে অনুপস্থিত ব্যাগের অভ্যন্তরের অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির বিরহ মিশ্রিত হইয়া তাহার মনে যে জটিল কুয়াশার উদয় হইয়াছিল ব্যাগের আবির্ভাবে তাহা লঘু হইয়া গেল এবং যেটুকু

থাকিল তাহার উপরে নিরঞ্জনের উপস্থিতির আনন্দ প্রতিফলিত হইয়া এক রঙীণ আবেশের সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

মেয়েদের কামরা। যতগুলি মেয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশী ছেলেমেয়ে এবং এই সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশী পোঁটলা পুঁটলি, তোরঙ, বিছানা, বাক্স, ব্যাগ, ডালা, কুলা, ধামা, কুঁজো প্রভৃতির অন্তহীন শ্রেণী ও অভ্রভেদী স্তূপ। তাহারি একান্তে, বাক্স-পেঁটরার উপত্যকার অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে তপশ্চারিণী অপর্ণার মতো ন-যযৌ ন-তস্থৌ প্রতিমা দণ্ডায়মানা। গাড়ীর বারো আনা দখল করিয়া এক সরাওগী পরিবার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রাষ্ট্রভাষার আলাপের সহিত ছেলেমেয়েদের কান্নার বিলাপ যুক্ত হইয়া এক প্রলাপের সৃষ্টি হইয়াছে। সরাওগী পরিবারের পুরুষগণ প্রতিমাকে কোণ-ঠাসা করিতে করিতে প্রায় তাহার দমবন্ধের যোগাড় করিয়া তুলিয়াছে—সহায় সম্বলহীন প্রতিমা নতমুখী দণ্ডায়মানা, আর নীলাভ আলো তাহার স্বেদোজ্জ্বল, শিথিল বেণী, শঙ্কিত-সুকুমার মুখমণ্ডলে এক মায়া-রসায়ন বিস্তার করিয়া দিয়াছে। সেই মুহূর্তে সেই বহুবার দৃষ্ট অথচ অদৃষ্টপূর্ব নারীমূর্তি দেখিয়া চৈত্রের প্রথম বিদ্যুৎ আভাসের মতো নিরঞ্জনের মনে ঝলক দিয়া উঠিল—প্রতিমা সুন্দরী। না, তাহার চেয়েও অধিক। সে প্রতিমাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বয়ং সৌন্দর্যকেই যেন আবিষ্কার করিয়া বসিল। ওই যে বেপথুমতী মূর্তি, ওই যে তন্বী রমণী, ওই যেন তাহার তমসার হৃদয়-বিদীর্ণ 'মা নিষাদ ত্বমগমঃ।' ওই যেন তাহার বেদনার বক্ষোদ্ভূত আনন্দের ঋক্।

ঠিক এইভাবেই, এই ভাষাতেই যে এই কথাগুলি তাহার মনে হইয়াছিল নিশ্চয় তাহা কেহ মনে করেন না। এমন হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়, সেইজন্যই তো শিল্পের ও শিল্পীর আবশ্যক। নিরঞ্জন যদি ফুটবল খেলোয়াড় না হইয়া শিল্পী হইত তাহা হইলে সে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিত আমরা তাহাই করিতেছি মাত্র। তাহার বকলমে আমরা লিখিয়া যাইতেছি।

নিরঞ্জনের প্রতিমাকে যে কেবল সুন্দরী বলিয়া মনে হইল তাহা নয়, তাহার মনে হইল, সৌন্দর্য বলিতে যাহা বোঝায় প্রতিমা তাহাই, তাহার মনে হইল সৌন্দর্যের অপর নাম প্রতিমা। শরতের সন্ধ্যাকাশের অলৌকিক আভা উপছিয়া পড়িয়া যেমন পৃথিবীকে সুন্দর করিয়া তোলে, গাছের মাথা, পাহাড়ের চূড়া, জলাশয়ের কিনারা, ঘাসের ডগাটি ও মানুষের মুখে সেই দীপ্তিতে এক অপরূপতা লাভ করে, প্রতিমার সমস্ত সত্তা হইতে এক অপূর্ব রসায়ন বিকীরিত হইয়া পারিপার্শ্বিককে ঠিক তেমনি এক প্রকার দিব্যমূর্তি দান করিয়াছে। গাড়ীর কামরার গদি-আটা মলিনতা, বিচিত্র পর্যায়ের জিনিষপত্র, কোলাহলরূপী ওই সরাওগী পরিবার—সমস্তই তাহাদের নিত্যকার তুচ্ছতা বর্জন করিয়া যেন এক সৌন্দর্যপ্রলেপ পাইয়াছে। প্রতিমার অনামিকার স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের ঘনরক্ত চুণির টুকরা হইতে কি এক দৈব আভা যেন বিচ্ছুরিত হইতেছে। ওই যে প্ল্যাটফর্মের এঞ্জিনের প্রান্তের লালবাতির আলোকে এঞ্জিন-উদগত বাষ্প—তাহা যেন আর ধূমজ্যোতি সলিলকণার ষড়যন্ত্র মাত্র নয়—

কোন্ অপ্সরীর চেলাঞ্চল প্রান্ত বাতাসে বিকম্পিত। ষ্টেশনের কোলাহলের হাজার রকম সুর ও স্বর, যেন বিচিত্র তন্তুতে বোনা একখানি অমূল্য কিঙ্খাব। আবার ওই যে লালবাতি নীল হইয়া গিয়া আসন্ন বিদায়কে স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার মূলে কি একটি কলের চাবির ইঙ্গিত? কখনই না। কত লক্ষ কোটি বৎসরের অভাবনীয় কার্যকারণ শৃঙ্খলের শেষপ্রান্ত ওই বাতির গোড়ায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। নিরঞ্জন পরম বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। কিম্বা চিন্তার শক্তিও যেন তাহার লোপ পাইয়াছিল। সে নিতান্তই যন্ত্রচালিত মূঢ়ের মতো চলাফেরা করিতে লাগিল। এমন কি গাড়ী ছাড়িয়া দিলে প্রতিমাকে ভালো করিয়া একবার সে সম্ভাষণ জানাইতেও পারিল না।

শূন্যট্রেণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া এক প্রকার অননুভূতপূর্ব গভীর বিষাদে তাহার চিত্ত ভরিয়া গেল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না—এই বিষাদের হেতু কি? প্রতিমার বিদায়ই কি এই বিষাদের কারণ? তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই কি তাহার বিষণ্ণতা? কিম্বা সুন্দরী প্রতিমাকে সে কখনো পাইবে না বলিয়াই তাহার দুঃখ? অথবা এমন যে দিব্য সৌন্দর্য তাহা ক্ষণস্থায়ী, প্রতিমার দেহে এক সন্ধ্যার পথিকের মতো আশ্রয় লইয়াছে, আর কয়েক বৎসর পরেই চিরকালের মতো তাহা অন্তর্হিত হইবে বলিয়াই এই বিষাদ? সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কোন্‌টা যথার্থ কারণ জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে, যথার্থ সৌন্দর্যের মধ্যে এক প্রকার অবর্ণনীয় বিষাদ নিহিত, শুভ্র সুকুমার সৌন্দর্যের সারভূত

তাজমহলের অভ্যন্তরে যেমন সুন্দরী মমতাজের মৃতদেহ সমাহিত। একবার সে যে-অন্ধকারে প্রতিমার ট্রেণ অন্তর্হিত হইয়াছে সেই দিকে তাকাইল। সূচীভেদ্য-তমিস্রার মধ্যে গার্ডের গাড়ীর পিছনকার লাল বাতিটি প্রতিমার অঙ্গুরীয়কের চুণির টুকরার মতো দীপ্যমান, আর কোথাও কিছু নাই। সে দৃষ্টস্বপ্ন ব্যক্তির মতো ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার একি অভাবিত অভিজ্ঞতা। বাঙলাদেশে এত গুণী জ্ঞানী ধ্যানী শিল্পী থাকিতে সৌন্দর্যলক্ষ্মী এই ফুটবল খেলোয়াড়ের চোখেই কেন প্রতিভাসিত হইতে গেলেন? পুরাকালে এদেশে মুনি ঋষি কবি ও পুণ্যাত্মার তো অভাব ছিল না। তবে ছন্দলক্ষ্মী কেন দস্যু রত্নাকরের ধ্যানের দ্বারাই আপনাকে আবিষ্কৃত করিলেন? প্রজ্ঞাবানেরা যাহার উত্তর দিতে পারেন নাই আমি তাহার কি চেষ্টা করিব?

মাতৃভক্তি

শাস্ত্রে আর মানুষে কেমন যেন চিরদিনের একটা আড়াআড়ি। শাস্ত্রের উপদেশ এক, মানুষে করে আর। শাস্ত্র বলে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়, মিথ্যা বলিতে মানুষের বড় আনন্দ; শাস্ত্র বলে পরদ্রব্য লোষ্ট্রের মত দেখিবে, মানুষ পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রের মতো কুড়াইয়া লয়; শাস্ত্রে জননী জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী বলিয়াছে ওদিকে পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়া পিতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়। ফলকথা শাস্ত্রে আর মানুষে চিরন্তন দ্বন্দ্ব—এ দ্বন্দ্ব বোধ করি ঘুচিবার নয়। আর যদি সত্যই কোন দিন ঘুচিয়া যায়—সংসার কি নীরস-ই না হইয়া পড়িবে?

শাস্ত্রে ও মানুষে এই বিরোধের কারণ কি? মানুষের স্বভাবের মধ্যেই কি বিরোধের হেতু নিহিত, না সংসারের স্বভাবের মধ্যেই তাহার স্থান? কিম্বা দুই দিকের ঘাত-প্রতিঘাতে এই দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হইয়া ওঠে? তত্ত্বালোচনার স্থান ইহা নয়—আর সাধ্যও আমাদের নাই—সে ভার পণ্ডিতদের উপরে ছাড়িয়া দিয়া—আমরা একটি গল্প বলিতে চেষ্টা করিব মাত্র।

এখন হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিহারের কোন শহরে প্রতিদিন সকাল বেলায় মাতা ও পুত্রকে বেড়াইতে দেখা যাইত। পুত্রের বয়স পাঁচ, ছয়; মাতার বয়স ত্রিশের নিচে। যে-বাড়িতে ইহারা থাকিত তাহার সম্মুখে একটি মাঠ ছিল। খুব ভোর বেলা উঠিয়া মাতা ও পুত্র এই মাঠে বেড়াইত। শীত গ্রীষ্ম

ঝা বর্ষা বলিয়া তাহাদের প্রাতর্ভ্রমণের কোন ব্যতিক্রম কখনো ঘটে নাই। যখন তাহারা বেড়াইতে বাহির হইত পাড়ায় তখনো কেহ ওঠে নাই, তাহারা যখন ফিরিতেছে প্রাতর্ভ্রমণকারীর দলের তখন বাহির হইবার পালা। ভ্রমণকারীর দল হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, চায়ের পূর্বে ফিরিতে হইবে—কিন্তু ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম না করিলে নিরুপায়, কাহারো বাজেট এক মাইল, কাহারো দেড় মাইল, যাহার ডাক্তারের যেমন উপদেশ। এই সব ভূতগ্রস্তদের মধ্যে পেন্সনধারীর সংখ্যাই অধিক। বাড়িতে যে একটু আরামে ঘুমাইবে সে সুবিধা তাহাদের নাই; স্ত্রী, পুত্র বা কন্যাগণ ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়াছে, ভোরের হাওয়ায় ফুসফুসজোড়া সতেজ হইলে তবে তো পেন্সনের জের টানিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে। বাড়ির কর্তার প্রতি কি গভীর কর্তব্য বোধ! তবে তাহা নিষ্কাম কিনা সে প্রশ্ন না তোলাই ভালো!

এই পেন্সন দীর্ঘতরকারীর দল ছুটিতে ছুটিতে দেখিতে পাইত মাতা ও পুত্র ফিরিতেছে। ভ্রমণকারীরা মনে মনে বলিত, আহা দুটিতে বেশ আছে। নিজেদের সংসারে প্রতিদিন ঠেলা খাইয়া উঠিয়া বাধ্যতামূলক ভ্রমণে বাহির হইতে হয়—সেই স্মৃতির সঙ্গে মাতা-পুত্রের ভ্রমণের সুখের তুলনা করিয়া অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহারা অগ্রসর হইত। বাস্তবিক এই দুই ভ্রমণের মূলেই প্রভেদ। একটি ভ্রমণ আনন্দের, একটি কর্তব্যের।

তখন শরৎ কালের শেষ, শীত তখনো পড়ে নাই, কেবল

উত্তরে হাওয়াটি শীতল হইয়া উঠিয়াছে, ঘাসের ডগায় শিশিরকণা উজ্জ্বল—কিন্তু তাহাকে আর পা দিয়া ছুঁইতে ইচ্ছা করে না, শিউলি, স্থলপদ্ম তখনো আগের মতই ফুটিতেছে, তাহারা শীতের অধিকার স্বীকার করে নাই—কেবল দূর নীলাভ দিগন্ত কুয়াশার শাদা গায়ের কাপড়খানা জড়াইয়া প্রচার করিতেছে যে, এবারে হী হী করিয়া কাঁপিবার পালা আসন্ন।

মাতা ও পুত্র ভ্রমণ সারিয়া ফিরিতেছে। ছেলেটি কয়েক গুচ্ছ কাশ ফুল সংগ্রহ করিয়াছে। সে বলিল—মা চল ঘুরে যাই, কয়েকটা স্থলপদ্ম নেবো।

মা বলিল—আবার স্থলপদ্ম কি হবে রে ?

পুত্র বলিল—আজ যে তোমার জন্মদিন।

গত বছর পুত্রের পিতা স্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাড়িতে উৎসব করিয়াছিল, ছেলে সে তারিখটি মনে রাখিয়াছে। মা নিজেই তাহার জন্মদিনের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, এখন তাহার মনে পড়িল! সে হাসিয়া বলিল—পাগল!

ছেলে বলিল—না মা, পায়ে পড়ি, চল। 'নিরালায়' অনেক ফুল ফুটে আছে, নিয়ে যাই।

দুইজনে 'নিরালায়' গিয়া অনেক ফুল তুলিল।

মা শুধাইল—হাঁরে খুন্‌চে, পুত্রের নাম খুন্‌চে, তুই বরাবর আমাকে এমনি ভালো বাস্‌বি ?

খুন্‌চে এমন প্রশ্ন শুনিয়া অবাক হইল। ভালোবাসিবে না তো কি ? কিন্তু একটা যা হোক কিছু উত্তর তো দেওয়া চাই। সে বলিল—নিশ্চয়। খুব। তুমি দেখো।

মা বলিল—যখন তোর বউ আসবে ?

খুঁন্‌চে অবাক্ হইল। বউ আসিবার সঙ্গে ভালো না বাসিবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—সে-ও বাসবে।

মা হাসিল। ছেলেও হাসিল।

দুইজনে এবারে বাড়ির দিকে চলিল। তরুণী মাতা ও বালক পুত্র, তরুণী উষা সদ্যজাগ্রত শিশু জগৎকে হাতে ধরিয়া যেন অগ্রসর হইতেছে। প্রাতভ্রমণকারীর দল তাহাদের দেখিয়া বলিল—আহা দুটিতে বেশ আছে। সংসার সুখের হইলে এমনি হয়।

এই ঘটনার পরে প্রায় চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। সে দিনের মাতা ও পুত্র আজ বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়। কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র বাড়ির প্রায়ান্ধকার ঘরে মাতা পীড়িতা, পুত্র এখনো অফিস হইতে ফেরে নাই। পুত্রের সাংসারিক আয় সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর ওজনের—তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়।

সন্ধ্যা ছয়টার সময়ে খুদিরাম অর্থাৎ সেদিনের খুন্‌চে, ক্লান্ত-দেহে অফিস হইতে ফিরিল। জামা কাপড় বদলাইবার পূর্বেই স্ত্রী বলিল—মাকে একবার ডাক্তার দেখানো দরকার।

স্বামী বোধ করি কোন কারণে পূর্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিল—ঝঙ্কার দিয়া বলিল—দরকার হয় তুমিই দেখাও, আমার সময় নেই!

স্ত্রী বলিল—আমি মেয়ে মানুষ কি করবো ?

স্বামী বলিল—তবে চুপ করে থাকো।

স্ত্রী চুপ করিল! কিন্তু তর্কস্থলে যখন কেহ বলে চুপ করিয়া

থাকো তাহার অর্থ তর্ক করিয়া যাও। স্ত্রী কথা বলিল না কাজেই স্বামীকে কথা বলিতে হইল—বুড়ো মানুষ, একটুতেই ভোগে। কথায় কথায় ডাক্তার ডাকতে গেলে আর চলে না।

কিন্তু অবশেষে ডাক্তার ডাকিতেই হইল। ডাক্তার আসিয়া বৃদ্ধাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পরীক্ষা করিয়া, এক্স-রে পরীক্ষা করিয়া একদিন খুদিরামকে জানাইয়া দিল যে—হাঁ রোগটা ক্যানসারই বটে, তবে কি না ভয়ের কারণ নাই।

খুদিরাম মূঢ়ের মত শুধাইল—চিকিৎসা ?

ডাক্তার বলিল—চিকিৎসার অভাব কি ? সেজন্য চিন্তা করবেন না—আমি আছি।

তাঁহার কথার অর্থ এই যে, ঔষধের অভাব হইলেও চিকিৎসকের অভাব হইবে না।

তারপরে তিনি বলিলেন—ওষুধ তো পরের কথা—এখন রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া চাই।

—কি কি দিতে হবে ?

ডাক্তার বলিয়া চলিল—ছানা, মাখন, দুধ, ঘি—বিধবা মানুষ কাজেই মাছ মাংস চলবে না, কিন্তু একটু করে 'বভরিল' দেওয়া যেতে পারে ; তাছাড়া পেস্তা, বাদাম, কিসমিস অবশ্যই দিতে হবে। পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে রোগীকে সবল করে রাখতে পারলে তবে তো চিকিৎসা !

খুদিরাম শুধাইল—চিকিৎসার খরচ কি রকম ?

ডাক্তার বলিল—এসব ব্যারামের চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য বই কি ! তবে কি না আমি আছি।

অর্থাৎ তুমি ব্যস্ত হইয়া যেন অন্য ডাক্তার ডাকিয়া বসিও না। এই উপলক্ষ্যে আমিই তোমার পকেট মারিবার ভার লইলাম।

ডাক্তার চলিয়া গেলে খুদিরাম পুষ্টিকর খাদ্য ও তাহার মূল্যের হিসাব করিয়া মোহগ্রস্তের মত বসিয়া রহিল। পুষ্টিকর দ্রব্যগুলির নাম সে শুনিয়াছে বটে তবে অধিকাংশই দীর্ঘকাল অনাস্বাদিত। তাহার জীর্ণ আয়ের হরধনুকে ব্যয়ের গুণ পরাইতে গেলে যে ভাঙিয়া পড়িবে তাহাতে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ থাকিল না।

তৎসত্ত্বেও মাতার চিকিৎসার অর্থাৎ ঔষধ পথ্যের জন্য খুদিরামকে উদ্যোগী হইতে হইল। তাহার সাধ্য হোক আর সাধ্যাতীত হোক মাতার চিকিৎসার জন্য তাহাকে ঋণ করিয়াও ব্যয় করিতে হইবে। শাস্ত্র, সমাজ এবং লোকাচার সমস্তই এই ব্যবস্থার অনুকূলে। আমরা সত্য কথাই বলিব, খুদিরামের এতখানি করিবার ইচ্ছা ছিল না, কারণ সাধ্য ছিল না—যে-ঋণ কখনো সে শুধিতে পারিবে না সে-ঋণ জানিয়া শুনিয়া কেন সে করিতে যাইবে? তাহার সাধ্যমত চিকিৎসা করাই কি তাহার কর্তব্য নহে? তদতিরিক্ত করা কি তাহার পক্ষে অন্যায় নহে? কিন্তু এ সব কথা কেবল নিজের মনেই চিন্তা করা চলে, লোকসমক্ষে প্রকাশ্য নহে। অনেকে বলিবেন—ইহা নিজের মনেও চিন্তার যোগ্য নহে। হোক বা না হোক খুদিরামের মনে এসব চিন্তা উদিত হইত বলিয়া কেহ তাহাকে কুপুত্র বলিলে আমরা তাহার সহিত একমত নহি। সংসারে আর দশ জন পুত্রের চেয়ে

মাতৃভক্তিতে খুদিরাম যে নিম্নতর ধাপের—এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

একদিকে বৃদ্ধা মুমূর্ষু জননীর ভোগে ছানা, মাখন, পেস্তা, বাদাম, দুধ, ঘি-র মাত্রা যতই বাড়িতে লাগিল খুদিরামের সংসারের অন্যান্য সকলের আহার্য হইতে মাছ, তরিতরকারি, তেল-নুনের মাত্রা ততই হ্রাস পাইতে থাকিল।

মাতার চিকিৎসা ও পথ্যের বহর দেখিয়া পাড়ার সবাই বলিত—হাঁ, মাতৃভক্তি একেই বলে। শুনিয়া খুদিরাম মনে মনে গজরাইত। তাহার অদৃষ্ট হাসিত। সেদিনকার প্রাতভ্রমণকারীর দল থাকিলে আজ কি বলিত!

যদি জিজ্ঞাসা করো এমন অসঙ্গত ভাবোদয় খুদিরামের মনে কেন হইল? তবে বলিব, শুধু খুদিরামের নয়, অনুরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকেরই মনে এইরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। তবে খুদিরাম ধরা পড়িল এইজন্যে যে, সে একজন সাহিত্যিকের হাতে পড়িয়া গিয়াছে।

আবার যদি জিজ্ঞাসা করো যে, কেন এমন কথা মনে উদিত হইয়া থাকে—তবে আমি কোন উত্তর না দিয়া খুদিরামের মুখমণ্ডলে চল্লিশ বৎসরের অর্থনৈতিক সংগ্রামের যে চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তাহার দিকে তোমাকে তাকাইয়া দেখিতে বলি; তাহার বাসস্থানের অস্বাস্থ্যকরতা ও পোষাক-পরিচ্ছদের জীর্ণতার দিকে একবার তাকাইতে বলি; অফিসে তাহার যে ঋণ হইয়াছে যাহার ফলে বহুকাল হইল পূরা বেতন সে পায় নাই—এবং আর কখনো যে পাইবে সে ভরসাও নাই, সে কথা চিন্তা

করিতে বলি ; অফিসের নিকটে যে বলিষ্ঠ কাবুলিওয়ালা বসিয়া থাকে তাহার বলিষ্ঠতর বংশদণ্ডের কথা ভাবিতে বলি ; তাহা ছাড়া, পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, বন্ধুবান্ধবের কাছে ঋণ ও হাওলাতের শতছিদ্র ঝাঁঝরিখানার কথা কল্পনা করিতে বলি। এইবার বুঝিতে পারিবে তাহার মাতৃভক্তিতে ভাঁটা পড়িবার কারণ। ভক্তি বল, স্নেহ বল, ভালবাসা বল, কিছুই অর্থ-নিরপেক্ষ নয়। দরিদ্র যে ধনীর চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতে অধিকতর কঠিন তাহা নয়—কেবল তাহার কোমলতা প্রকাশের সুযোগের অভাব !

এই অর্থনৈতিক কুরুক্ষেত্রে সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত যুধ্যমান খুদিরামের মনে চল্লিশ বৎসর আগেকার সেই সুখের স্মৃতি এক একবার উদিত হইয়া তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িত, তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিত। সে ভাবিত—আহা সেই তো বেশ ছিল ! তাহার বড়ই দুঃখ হইত। পাঠক, আমাদেরও দুঃখ হয়। কিন্তু কি করিব—ইহাই সংসারের প্রকৃতি।

রাজকবি

মহাকবি কালিদাসের মৃত্যুর পরে তাঁহার শূন্য আসনখানির অধিকার লইয়া উজ্জয়িনীতে এক জটিল সমস্যা দেখা দিল। মহাকবির রাজদেহ শ্মশান অভিমুখে বাহিত হইয়া চলিল, সেই শবযাত্রার চতুর্দ্দিকে শক, হুণ, যবন প্রভৃতি জাতি হুঙ্কার করিতে করিতে ছুটিল। ইহাই তাহাদের শোক প্রকাশের রীতি। সকলেই আশা করিয়াছিল উজ্জয়িনীর সাহিত্যিকগণ শবানুগমন করিবে। কিন্তু তাহারা শ্মশানের দিকেই ঘেঁসিল না। তাহারা সরাসরি মহাকবির বাড়ীতে গিয়া তাঁহার আসনখানি লইয়া কাড়াকাড়ি সুরু করিয়া দিল। উজ্জয়িনীতে সাহিত্যিকের সংখ্যা বড় মন্দ নহে। কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, নিবন্ধকার, গণৎকার যে-যেখানে ছিল সবাই বলিল—আসনখানি তাহারই প্রাপ্য, কারণ এখন সে-ই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। কেবল শ্বেত-হুণবংশীয় একজন বলিল যে, সে কালিদাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, এতদিন যে তাহাকে রাজকবি বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই তাহা নিতান্তই অবিচার ছাড়া আর কিছু নহে।

সবাই বলিল—এ আবার কি কথা?

রক্তাক্ত শ্বেত হুণ বলিল—তাহা ছাড়া আর কি? কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' আমার রচিত 'অভিজ্ঞান-শর্ষপ' কাব্যের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাতে সবাই ক্ষেপিয়া উঠিয়া শ্বেতহুণকে প্রহার করিল। শ্বেতহুণ 'ভূমা' 'ভূমা' রবে

কাঁদিতে কাঁদিতে সেস্থান ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাতে মূল সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হইল না। সকলে আসনখানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল। আসন ছাড়িয়া কাহারো নড়িবার সাহস নাই—পাছে একজন নড়িলে অপরে সেই শূন্যস্থান অধিকার করিয়া লয়। কাজেই অনাহারে অনিদ্রায় সকলে সেখানে পড়িয়া থাকিল। সাতদিন এইরূপ চলিলে—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কাছে এই দুঃসংবাদ পৌঁছিল। তিনি মীমাংসার জন্য কবি-নিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজকে সম্মুখে দেখিয়াও কেহ উঠিল না—প্রত্যেকেই অপরকে সন্দেহ করে।

তখন মহারাজ বলিলেন—বাপু হে, তোমরা সবাই গুণী, কিন্তু ওই কাষ্ঠাসনখানা জীর্ণ। তখন আমার অবস্থা ভালো ছিল না বলিয়া, সেগুন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কাঁঠাল কাঠেই কাজ সারিতে হইয়াছিল। এখন তোমাদের কাড়াকাড়িতে ইহা ভাঙিয়া গেলে তোমরা কোথায় বসিবে? কাজেই ওখানা ছাড়িয়া দাও। তোমরা সকলে কাল আমার সভায় যাইবে, সেখানে নিজ নিজ গুণ বর্ণনা করিবে, সামাজিকগণ যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন—তিনিই এই আসনে বসিবার অধিকার পাইবেন।

মহারাজের বাক্যে সবাই আশ্বস্ত হইল—সবাই ভাবিল সে-ই বসিতে পারিবে এই আসনে, কেহ কাহারো চেয়ে নিজেকে ন্যূন মনে করিত না। সাহিত্যিকগণ কবিগৃহ ত্যাগ করিলে মহারাজ নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাষ্ঠাসনে গোটা দুই লৌহশলাকা বসাইয়া

দিলেন। টানাটানিতে আসনখানার গ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তারপরে মহারাজ নিজের প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন।

হায়, মহারাজ! তুমি এ কী করিলে? আর কিছুদিন সাহিত্যিকগণ ওখানে পড়িয়া থাকিলে না খাইতে পাইয়াই মরিত, তাহাতে একসঙ্গে উজ্জয়িনীর বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। উজ্জয়িনীর গ্রন্থিচ্ছেদ, নীবীচ্ছেদ, সুরাযুদ্ধ, নারীহরণ প্রভৃতি বহু অপরাধের সংখ্যার যে হ্রাস হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহারাজ, তুমি কয়েকজন সাহিত্যিক বাঁচাইতে গিয়া কত অজস্র লোকের না বিপত্তির কারণ ঘটাইলে!

(২)

পরদিন প্রাতঃকালে যথাসময়ে মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজসভায় সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া পাত্রমিত্র, অমাত্য, সেনাপতি, মন্ত্রিগণ, রাজপণ্ডিত, রাজ পুরোহিত এবং অষ্টরত্ন (হায়, কালিদাস মৃত বলিয়াই এই সমস্যা!) উপবেশন করিলেন। উজ্জয়িনীর কৌতূহলী জনতা সভার একটি বৃহদংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আর অপর একদিকে সাহিত্যিকগণ অধীরভাবে অপেক্ষমাণ। তাঁহাদের প্রত্যেকেই ভাবিতেছে আর কিছুক্ষণ পরেই আমি মহাকবির আসনে উপবিষ্ট হইব—তখন লোকে আমাকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিতে বাধ্য হইবে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মহাশয়গণ, আপনারা অবগত আছেন যে, মহাকবি

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শূন্য আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা আছে এমন সাহিত্যিককে নির্ব্বাচন করিবার জন্যই আজ সাহিত্যিকগণকে তথা আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। চন্দ্রহীন রজনীর ন্যায় রাজ-কবিহীন উজ্জয়িনী আজ অন্ধকার। যতক্ষণ না কোন কবি মহাকবির আসনে উপবিষ্ট হইতেছেন ততক্ষণ এই অন্ধকার দূরীভূত হইবে না। কবিগণ সমাগত—এক্ষণে তাঁহারা স্ব স্ব কীর্ত্তির পরিচয় দান করিবেন। সমস্ত পরিচয় অবগত হইয়া কালিদাসের যোগ্য উত্তরাধিকারীকে আপনারাই নির্ব্বাচন করিবেন।

বিক্রমাদিত্যের বাক্য শেষ হইবা মাত্র সাহিত্যিকদের মধ্য হইতে একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

মহারাজ, আমি একজন কথা-সাহিত্যিক, আমি অত্যল্প কালের মধ্যে একশ উনিশ খানা উপন্যাস লিখিয়া ফেলিয়াছি—কাহ্লীক হইতে লৌহিত্য নদ পর্য্যন্ত আমার খ্যাতিতে প্রতিধ্বনিত। আর বিস্ময়ের কথা এই যে, এদিকে আমার খ্যাতি যতই বাড়িতেছে আমার বয়স ততই কমিতেছে। পাঁচ বৎসর আগে আমার বয়স ছিল পঞ্চাশ—এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম পঁয়তাল্লিশ ; আশা করিতেছি আর কয়েক বছরের মধ্যেই আমি আমার পুত্রের চেয়েও বয়সে ছোট হইয়া পড়িব। মহারাজ, আমি গুণাঢ্য বা বিষ্ণুশর্ম্মার মতো অলীক কাহিনীর স্রষ্টা মাত্র নই, আমি একজন সমাজ-চেতন জীব, গণ-বেদনায় আমার চিত্ত অস্থির।

সে আরও অনেক কথা বলিত, কারণ এই ব্যক্তির কথা-

সাহিত্যিক-অভিধা একান্ত সত্য। তাহা ছাড়া কথা বলিবার সময়ে ইহার তাড়িত মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া ওঠে, গলা সমুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে—এদিকে ওদিকে লোকটি সগর্ব্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, তখন তাহাকে অনেকটা গোবর-গাদার চূড়াবলম্বী প্রকম্পিতঝুঁটি কুক্কুট-চূড়ামণির মতো দেখায়! কিন্তু আজ আর সে অবসর পাইল না।

গত কল্যকার সেই রক্তাল্প শ্বেত হূণ বলিয়া উঠিল—মহারাজ আমরা কথা-সাহিত্য লইয়া কি করিব? আমরা কবি চাই। আমি যে একজন কবি তাহা এ দেশের লোকে না জানিলেও শ্বেতদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ, মায়াদ্বীপ, ও মহাচীনের সুধীগণ বিলক্ষণ জানেন। তাহা ছাড়া, আমি মহাকবির সঙ্গে বহুকাল বাস করিয়াছি, তাহাও কি একটা গুণ নয়? তিনি যে পাত্রে দধি খাইতেন এখনও আমি সেই পাত্রে দধি খাইয়া থাকি।

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই শক বংশীয় একজন কবি বলিল—

মহারাজ কবি তো আমি! সাধ্য কি এক অক্ষর তাহার লোকে বুঝিতে পারে! আর বুঝিতে পারে না বলিয়াই লোকে তাহার আদর করে। যে-ধাঁধার সমাধান হইয়া গিয়াছে সেদিকে কেহ কি ফিরিয়া তাকায়?

এমন সময়ে সাহিত্যিক জনতার মধ্য হইতে একজন মহিলা অগ্রসর হইয়া আসিল। সে বলিল—মহারাজ, আমি একজন সাহিত্যিকা।

সকলে তাকাইয়া দেখিল বর্ত্তুলাকার একটি রমণী। তাহার

মুখমণ্ডল বর্ত্তুলাকার, তাহার চক্ষুর্দ্বয় ছুইটি ঘূর্ণ্যমান বর্ত্তুল। কেশরাশি মুষ্টিমেয়। অলক্তলেপিত রক্ত-ওষ্ঠাধর দু'আনা দামের দু'টুকরা কুমড়ার ফালির মতো স্থূল।

মহিলাটি বলিল—মহারাজ, এ জন্মে সাহিত্যিকা হইলেও গত জন্মে আমি সাহিত্যিকা ছিলাম না—সত্য বলিতে কি, আমি মানবীই ছিলাম না। আমি ছিলাম পূতনা রাক্ষসী। কংসের পরামর্শে শিশু কৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইয়া বধ করিবার উদ্দেশ্যে আমি যশোদার গৃহে গিয়াছিলাম—মহারাজ অবশ্যই সে কাহিনী পড়িয়াছেন। আমার এই অপরাধের জন্য দেবতারা আমাকে শাপ দিয়াছেন। তাঁহাদের অভিশাপে আমি সাহিত্যিকা হইয়া জন্মিয়াছি। একশত একজন সাহিত্যিককে স্তন্য দান করিতে পারিলে আমার মুক্তি। এ পর্য্যন্ত আমি একজনকেও স্তন্য দান করিতে সমর্থ হই নাই। অন্তরায় আমার ওষ্ঠাধার। রাতের বেলাতে, এমন কি দিনের বেলাতেও আমাকে দেখিবা মাত্র—'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষ মাঝে চিত্ত আত্মহারা।' সাহিত্যিকগণের যে এমন নারীভীতি তাহা ঠেকিয়া ঠেকিয়া বুঝিয়াছি। এক্ষণে আমি যদি ওই সিংহাসনে বসিতে পারি, তবে হয়তো আমার সমস্যার একটা সুরাহা হইতে পারে। নবীন সাহিত্যিকগণ আমার কাছে সার্টিফিকেট লইবার জন্য আসিবে—তখন পূর্ব্বাহ্ণেই একটা চুক্তি করিয়া লইলেই হইবে। তাহাতে দু'জনেরই লাভ।

মহিলা সাহিত্যিকাটী বসিবা মাত্র আর একজন উঠিল, তারপরে আর একজন, তারপরে অপর একজন,—কেহ নরম,

কেহ গরম, কেহ প্রবন্ধকার, কেহ নিবন্ধকার, কেহ গণৎকার, কেহ ঋনৎকার—তাহাদের আর শেষ নাই। ক্রমে তাহারা কথা হইতে তর্ক, তর্ক হইতে বিতণ্ডা, এবং বিতণ্ডা হইতে দ্বন্দ্ব এবং হাতাহাতিতে গিয়া উপনীত হইল। তখন তাহারা পরস্পরের উদ্দেশ্যে যে-ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল, সভার একপ্রান্তে উপস্থিত কৌতূহলী মৎস্যজীবিনীগণ তাহা হইতে অনেক নূতন ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়া লইল। শকহুণ-বিজেতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চিত্তেও সাহিত্যিকগণ ভীতি সঞ্চার করিয়া দিল—এমনি তাহাদের প্রতাপ।

মহারাজকে বিহ্বলের মতো বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মন্ত্রী বলিল—মহারাজ ভয় কিসের? সেবার যখন শকগণ উজ্জয়িনীর প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছিল—এ বিপদ কি তাহার চেয়েও বড়?

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—মন্ত্রী, এখন আমি কি করিব? কেন আমি ইহাদের ডাকিতে গেলাম? দেখিতেছি ইহারা সকলেই সমান গুণী। কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে আমি রাজকবি পদে বরণ করি?

মন্ত্রী বলিল—মহারাজ এক কাজ করা যাক্‌। পূর্ব্বকালে কোন দেশের রাজ-সিংহাসন শূন্য হইলে রাজা নির্ব্বাচনের ভার রাজহস্তীর উপরে অর্পিত হইত। রাজহস্তী দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া যাহার ললাটে রাজতিলক আছে তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইয়া আসিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রাজকবি নির্ব্বাচনের ভার রাজহস্তীর উপরে ছাড়িয়া দিলে কেমন হয়?

বিদূষক বলিল—মন্ত্রী সত্য কথাই বলিয়াছেন। পশু-দৃষ্টিতেই সাহিত্যিকের পরিচয় ধরা পড়িবে—মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

তখন মহারাজ ঘোষণা করিলেন যে, আগামী কল্য রাজহস্তীকে নগরে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সে যে-ব্যক্তিকে মাথায় করিয়া লইয়া ফিরিবে তাহাকেই কবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

সভাগৃহের প্রচ্ছন্ন কোণ হইতে কে একজন বলিল—সে যদি সাহিত্যিক না হয়?

মহারাজা বলিলেন—অবশ্যই সে সাহিত্যিক হইবে। মানুষে না পারিলেও পশুতে অবশ্যই যথার্থ সাহিত্যিককে চিনিতে পারিবে।

সাহিত্যিকগণ আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রত্যেকেই ভাবিল আগামী কল্য সে মহাকবির আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে। পশুর বিবেচনা শক্তির উপরে সাহিত্যিকগণের বড়ই ভরসা।

(৩)

পরদিন প্রত্যূষে রাজহস্তীকে উত্তমরূপে স্নান করাইয়া, উত্তম ভূষণ ও সুগন্ধি মাল্যে সজ্জিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে রাজপুরোহিত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বৎস, মানবসমাজে হস্তীমূর্খ বলিয়া একটি অপবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা যে কত মিথ্যা আজ সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি যে-কাজে ব্যর্থ হইয়াছে, সেই কাজে তোমাকে প্রেরণ করা হইতেছে। যাও, বৎস,

তোমার সহজাত বুদ্ধির দ্বারা রাজটীকা-সম্পন্ন কবিশ্রেষ্ঠকে তুমি নির্ব্বাচন করিয়া আনিয়া মহাকবির পরিত্যক্ত আসনে বসাইয়া দাও।

রাজপুরোহিত থামিলে, রাজহস্তী হেলিতে-দুলিতে মহাকবির মেঘদূতে বর্ণিত জলভার-পুঞ্জিত-জলদের ন্যায় কবি-অলকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল—যে-অলকায় উজ্জয়িনীর অচির ভবিষ্যতের কবিশ্রেষ্ঠ যক্ষ-বিরহিণীর মতো দণ্ড পল গুণিয়া রাত্রি যাপন করিতেছে।

এদিকে রাজহস্তীর দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার আশায় যাবতীয় সাহিত্যিক তাহার পায়ের কাছে, তাহার চলার পথে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িল, কেহ বা তাহার শুঁড়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগিল, কেহ বা একটি কদলী বৃক্ষ আনিয়া তাহাকে লুব্ধ করিতে লাগিল, আবার স্বরচিত হস্তিস্তোত্র পাঠ করিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। অবশেষে সেই শকবংশীয় কবি আসিয়া যখন 'হাতী ও মার্ব্বেল' নামক কবিতা আবৃত্তি করিল তখন সেই শান্ত স্বভাব হাতী ক্ষেপিয়া উঠিয়া আর্ত্ত-বৃংহিতে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু পলাইবার সময়েও সে রাজকীয় সৌজন্য বিস্মৃত হয় নাই—একজন সাহিত্যিকও তাহার দ্বারা বিমর্দ্দিত হইল না। সাহিত্যিকগণ তাহার পিছু পিছু ছুটিল—ভীত রাজহস্তী পথিমধ্যে একবারও না থামিয়া একেবারে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে দেখিল তাহার গাত্র বাহিয়া কাল-ঘাম ঝরিতেছে।

মন্ত্রী বলিল—মহারাজ হাতী তো বিফল হইল।

মহারাজ বলিলেন—এখন কি করা যায় ?

মন্ত্রী বলিল—তাই তো ভাবিতেছি।

তখন একপার্শ্ব হইতে বিদূষক বলিল—মহারাজ এ হাতীর কর্ম্ম নয়। অন্য এক পশু ছাড়িয়া দিতে হইবে।

—কি পশু ?

—অশ্ব ? উষ্ট্র ? সিংহ ? কুক্কুর ?

বিদূষক বলিল—ও সবের কর্ম্ম নয়। মহারাজের যে রাজ-রজক আছে তাহার গর্দ্দভটিকে ছাড়িয়া দিন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, সেই গর্দ্দভ অবশ্যই আপনাদের বাঞ্ছিত সাহিত্যিককে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া আসিবে।

মন্ত্রী শুধাইল—তুমি জানিলে কি প্রকারে ?

বিদূষক বলিল—আমিও যে এক সময়ে সাহিত্যিক ছিলাম।

তখন স্থির হইল আগামী কল্য প্রাতে রাজ-রজকের রাজ-গর্দ্দভ সাহিত্যিক-নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

(৪)

পরদিন প্রত্যুষে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিয়া রাজগর্দ্দভকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

সাহিত্যিকগণ আগের দিনের মতই তাহার পায়ের কাছে আসিয়া উমেদার হইয়া শুইয়া পড়িল। রক্তাল্প শ্বেতহুণ গর্দ্দভ ছাড়িয়া দিবার খবর আগেই পাইয়াছিল—তাই সে 'রাসভ বন্দনা' নামে একটি কবিতা লিখিয়া আনিয়াছিল। সে সেই কবিতাটি পড়িতে সুরু করিল।

"এসো গো এসো রাসভ
তোমার বাবা হলেন বাসব,
আমি যাবো হারাপ্পা
নহে নহে এ ধাপ্পা,
কোথায় তোমার মা সব ?"

কবিতাটি শুনিয়া রাজগর্দ্দভ ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল। আর অমনি শ্বেতহুণ উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বুঝিয়াছে, বুঝিয়াছে, আমার কবিতা গাধাতে বুঝিয়াছে। কোন মানুষে যাহা বুঝিতে পারে নাই—আজ গাধাতে তাহা বুঝিল। এই প্রথম—কিন্তু আশা করি শেষ নয়।" নিশ্চয়ই নয়। সংসারে গাধাতো আর একটি নয়।

কিন্তু সাহিত্যিকদের আশা সফল হইল না। সে কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া নগর-প্রান্তের একটি বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই বাড়ীতে এক ব্যক্তি বাস করিত, সে কখনো কিছু লিখিয়াছে বলিয়া কেহ জানে না। সাহিত্যের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে যে একেবারে নাই তাহাও বলা যায় না। সাহিত্য-সম্মেলন হইলে সভা-সজ্জার ভার তাহার উপরে পড়িত ; বিদ্যামন্দির সে চূণকাম করিত ; কোন সাহিত্যিকের বাড়ীতে বিবাহাদি উৎসব হইলে সে দধির ফরমাইস দিয়া আসিত এবং যথাকালে কোমরে গামছা বাঁধিয়া পরিবেশনে লাগিয়া যাইত ; কোন সাহিত্যিকের মৃত্যু হইলে সে লোক ডাকিতে বাহির হইত ; কাজেই সে যে সাহিত্যিক নয় তাহা বলা যায় না। একমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া সাহিত্যিকের আর সব গুণই তাহাতে

ছিল। সাহিত্যিক হওয়ার পক্ষে সাহিত্য-সৃষ্টি নিতান্তই গৌণ। না থাকিলেও চলে, থাকিলেও ক্ষতি নাই।

রাজগর্দ্দভ তাহাকে পিঠে তুলিয়া লইয়া রাজপ্রাসাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া এক সাহিত্যিকগণ ছাড়া আর কেহই বিস্মিত হইল না। বরঞ্চ তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—ভালই হইয়াছে, লোকটা নির্ঝঞ্ঝাট! বিশেষ, কাব্য রচনা করিয়া মানুষকে বিরক্ত করিবার বদ অভ্যাস ইহার নাই।

রাজগর্দ্দভ লোকটিকে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল। মহারাজ বলিলেন—এসো কবিশ্রেষ্ঠ! তোমার জন্য রাজকবির আসন অপেক্ষা করিতেছে। লোকটি গম্ভীরভাবে কালিদাসের আসনে গিয়া বসিল। জীর্ণ কাষ্ঠাসন মড়মড় করিয়া উঠিল। সকলে রাজকবির জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই হইতে উজ্জয়িনীতে কবি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটিল। কেবল মাঝে মাঝে রক্তাল্প শ্বেতহূণ চীৎকার করিয়া উঠিত—"বুঝিয়াছে, বুঝিয়াছে, গাধাতে আমার রচনা বুঝিতে পারিয়াছে।"

অন্নকষ্ট

রায় বাহাদুর অন্নদা মুস্তফী অন্নকষ্টে পড়িয়াছেন। রায় বাহাদুর দরিদ্র নন—বরঞ্চ তাঁহাকে ধনী বলাই উচিত। কলিকাতার উপরে তাঁহার পাঁচখানা বাড়ী—গোটা দুই বস্তি, খান চার পাঁচ মোটর গাড়ী, ব্যাঙ্কে স্বনামে বেনামে বহু টাকা, সিন্দুকে বোধ করি ততোধিক, দেশে জমিদারী, দেহে মেদ ও মগজে বুদ্ধি—ধনীর প্রায় সবগুলি লক্ষণই তাঁহাতে বিরাজমান। তৎসত্ত্বেও সত্য সত্যই তাঁহার আজ অন্নকষ্ট উপস্থিত। জানি আপনারা বিশ্বাস করিতেছেন না—কিন্তু আপনাদের দোষ দিই না, কারণ কথাটা আমিও প্রথমে বিশ্বাস করি নাই। অবশেষে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে এবং ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে, রায় বাহাদুর সত্য সত্যই অন্নকষ্টে পতিত।

খবরটা বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই—কিন্তু ততোধিক বিস্ময়জনক ইহার বিপরীত খবরটা। অন্নদা মুস্তফী যখন দরিদ্র ছিলেন (অবশ্য তখন রায় বাহাদুরও ছিলেন না) তখন তাঁহার অন্নকষ্ট ছিল না। তখন তাঁহার দরিদ্রের যোগ্য আর সব কষ্টই ছিল—কেবল এক অন্নকষ্ট ব্যতীত। আজ তাঁহার অর্থের অভাব নাই বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কি অনর্থপাত! যে-অর্থ আর সকলের ক্ষেত্রে অন্নকষ্ট দূর করে সেই অর্থই তাঁহাকে অন্নকষ্টে ফেলিয়াছে।

পাঠক, তুমি হয় তো ভাবিতেছ যে এমন ধনীর অন্নাভাব

ঘটিল কি করিয়া ? কিন্তু আমি তো অন্নাভাব বলি নাই—অন্নকষ্ট মাত্র বলিয়াছি। তবে কি অন্নাভাব ও অন্নকষ্ট এক বস্তু নয় ? সব সময়ে নয়। অন্নাভাব ঘটে দরিদ্রের—আর ধনীদের ভাগ্যে অনেক ক্ষেত্রেই অন্নকষ্ট ঘটিয়া থাকে। অন্নদাবাবুর অন্নের অপ্রতুল হয় নাই—কেবল সেই অন্ন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আজ অন্তর্হিত। ডাক্তারে বলিয়াছে আহার বিষয়ে রায় বাহাদুরের সামান্য একটু অসংযম ঘটিবে কি অমনি তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কারণ শিবের জটায় সর্পের মতো মারাত্মক মাত্রায় 'ব্লাডপ্রেশার' রায় বাহাদুরের মাথায় ফণা তুলিয়াই আছে ; আর মেদের বেষ্টনী শরীরে এমন পুরু যে হৃৎপিণ্ডের দব্‌দবানি বিচক্ষণতম চিকিৎসকের পক্ষেও ধরা কঠিন। কাজেই আহার-সংযমী রায় বাহাদুর দুপুর বেলায় মাগুর মাছের ঝোল দিয়া এক ছটাক সরু চাউলের ভাত খান ; রাতের বেলায় শুধু সাগু বা বার্লি ! ইহাই রায় বাহাদুরের অন্নকষ্টের স্বরূপ। ইহা অন্নাভাবের কষ্ট না হইলেও—অন্নকষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি ? না থাকিলে না খাওয়া আর থাকা সত্ত্বেও না খাওয়ার মধ্যে কোন্‌টা অধিক দুঃখজনক ? রায় বাহাদুর বলিবেন—তাঁহারটাই !

কিন্তু আগেই বলিয়াছি এমন অন্নকষ্ট তাঁহার বরাবর ছিল না। তখন সামান্য যাহা জুটিত তিনি খাইতে পারিতেন। তখন তাঁহার ওজন দেড় মণের কাছে ছিল—আর এখনকার মেদ-মেদুর দেহের অধিকাংশ চর্ব্বি তখন ক্ষীর-সর-নবনীত ও সন্দেশাদি আকারে দোকানে ও গোপগৃহে সজ্জিত ছিল। আর মগজের বুদ্ধি তখনও আত্মবিকাশ করিবার অবকাশ পায় নাই।

এমন সময়ে মহাযুদ্ধ আলাদিনের প্রদীপ হাতে করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই প্রদীপটি কাড়িয়া লইবার জন্য ঘুঁটে-ওলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সে কি মারামারি! দীর্ঘকালের জন্য প্রদীপটি কেহ পায় না। কেহ একরাত্রির জন্য পাইল, কেহ এক মাসের, কেহ বা দুই মাসের জন্য! যার হাতে পড়িল সে-ই এক ঘষা মারিয়া ধন-দৌলতের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিল। অন্নদাবাবুর হাতেও দু'চার দিনের জন্য প্রদীপটি আসিল। তিনি নিপুণহস্তে প্রদীপ ঘষিয়া ঐশ্বর্য্যের দাবানল জ্বালাইয়া তুলিলেন। সেই দাবানলের দীপ্তিতে তাঁহার রাত্রের নিদ্রা আগেই গিয়াছিল—এখন সেই দাবানলের অগ্নি জঠরাগ্নিরূপে তাঁহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে—তিনি অন্নকষ্টে ভুগিতেছেন।

যখন যুদ্ধ বাধিবার সংবাদ অনেকের মাথায় বজ্রের মতো পড়িল, অন্নদাবাবুর মাথায় পড়িল একটি টিকটিকি। উক্ত সরীসৃপ তাঁহার মাথায় পড়িয়াই তিনবার টিক টিক শব্দে ডাকিয়া উঠিয়া এক লাফে ঘরের মেঝেতে পড়িয়া প্রস্থান করিল। অন্নদাবাবু জানিতেন টিকটিকি মাথায় পড়িয়া ডাকিলে রাজযোগ উপস্থিত হয়—কিন্তু জন্তুটার রং ঈষৎ রক্তাভ হওয়া দরকার। তিনি টিকটিকির পেটের রং পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যে তাহার পিছন পিছন ছুটিলেন, কিন্তু অবাধ্য সরীসৃপ ঘরের নর্দ্দমায় ঢুকিয়া পড়িল। অন্নদাবাবু ভিতরে উঁকি মারিলেন, টিকটিকিটাকে দেখিতে পাইলেন না—কিন্তু কি একটা বস্তু চকচক করিয়া উঠিল? সেটাকে বাহির করিয়া তিনি দেখিলেন একটি গিনি!

অন্নদাবাবু বিস্মিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, মুখে তাহার রা সরিল না। বিস্ময়ের ধাক্কা ভাঙিলে তিনি গিনিটি কপালে ঠেকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে যুদ্ধ তাঁহার কাছে আলিবাবার স্বর্ণগহ্বরের দ্বার খুলিয়া দিবার জন্যই সমুপস্থিত!

বাস্তবিক যুদ্ধ সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেরই কি এইরূপ ধারণা নয়? তাহাদের কাছে হিট্‌লার, বৃহত্তর জার্ম্মানী, ফ্যাসীবাদ, সাম্রাজ্যবাদ—সবই মায়া, সবই অলীক। তাহাদের কাছে যুদ্ধের একমাত্র সার্থকতা—তাহাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন! একদিকে লক্ষ লক্ষ লোক মরিল, আর একদিকে লক্ষ লক্ষ লোক ফাঁপিল; একদিকে দুঃখ, আর একদিকে ঐশ্বর্য্য; একদিকে ধ্বংস, আর একদিকে নতুন নতুন বাড়ী ওঠা; কত লোক শীর্ণ হইল আর তৎপরিবর্ত্তে কতলোক স্থূল হইল, কতলোকের অন্নাভাব—আর অন্নদাবাবুর মতো কত লোকের যে অন্নকষ্ট তাহার আর ইয়ত্তা নাই! 'কনসারভেশন অব্ এনার্জ্জি'র একেবারে চরম উদাহরণ।

যুদ্ধের আগে অন্নদাবাবু চাকরি-হাটায় হাটাহাটি করিতেন। যুদ্ধ লাগিলে তিনি অন্যান্য ভাগ্যান্বেষীর মতো মুর্গিহাটায় হাটাহাটি সুরু করিলেন। লোহা, পাট, কাঠ, চূণশুরকি প্রভৃতির সোপান বাহিয়া তিনি যখন খানিকটা উচ্চে উঠিয়াছেন—তখন দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। একজনের যখন দুর্ভিক্ষ তখন অপরের সুভিক্ষ হইতে বাধা নাই। অন্নদাবাবু একটি লঙ্গরখানার পরিচালক হইয়া বসিলেন এবং সুরাবর্দ্দি-খিচুড়ি দান করিয়া বহুলোকের প্রাণ

হরণ করিলেন। অবশ্য খিচুড়ির সরকারী 'ফরমুলা' অন্নদাবাবুর প্রতিভায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। সেইসঙ্গে তিনি একটি এরোড্রম তৈয়ারীর কন্‌ট্রাক্টও পাইলেন। কিন্তু যুদ্ধ তাঁহার আশানুরূপ দীর্ঘতা পাইল না। হঠাৎ যখন যুদ্ধ শেষ হইল অন্নদাবাবু দেখিলেন তাঁহার তহবিলের স্ফীতি এমন হয় নাই যাহাতে তাঁহার অন্নকষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই যাঁহার মাথায় টিকটিকি পড়িয়া তিনবার ডাকিয়াছে তাহার তো এরূপ হইবার কথা নয়!

অবশেষে অন্নদাবাবুর স্বুবর্ণ স্বুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঘের শেষে শীত যেমন একবার অন্তিম-কামড় দিয়া তাহার প্রতাপ বুঝাইয়া দেয়—যুদ্ধের শেষে তেমনি 'নোট-অর্ডিনান্স' প্রচারিত হইয়া ভাগ্যান্বেষীদের শেষ স্বুযোগ দিল। নোট-অর্ডিনান্স প্রকাশিত হইবামাত্র অন্নদাবাবু কিছু টাকা সঙ্গে করিয়া গ্রামাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। সেখানে বিধবা ও অসহায় ব্যক্তিদের সঞ্চিত একশত ও হাজার টাকার নোটগুলির উপরে তাঁহার ভরসা। অল্পকালের মধ্যেই তিনি একশ টাকার নোট পঁচিশ টাকায় এবং হাজার টাকার নোট তিনশ চারশ টাকায় কিনিয়া লইয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া একটি বড় বাড়ী কিনিয়া ফেলিয়া সেই টিকটিকির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার নামকরণ করিলেন—'টিকটিকি-নিবাস।'

এবারে অন্নদাবাবুর আশা পূর্ণ হইল। তিনি ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থায়ী ও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন এবং তাঁহার অন্নকষ্ট আরম্ভ হইল।

বিচক্ষণ ডাক্তারের দল আত্মন্ত পরীক্ষা করিয়া বলিল—'হেভি ব্লাড প্রেশার।' তাঁহার আহার একরকম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। দুপুরবেলায় এক মুঠা ভাত ও রাত্রে সাগু বা বার্লি। তাহার বেশী কিছু গ্রহণ করিলেই তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

অথচ তাঁহার অভাব নাই। অন্নদাবাবুর পুত্র পরিজন ঠিক তাঁহার সম্মুখেই সাতাশ তারায় বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় নানাজাতীয় খাদ্যের বাটি সাজাইয়া আহারে বসে! অন্নদাবাবু পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মার খাদ্য গ্রহণ দেখিতে থাকেন। এক একবার মনে হয়—দূর ছাই, ডাক্তারে অমন অনেক কথাই বলে—পেট ভরিয়া খাওয়া যাক্। তথাপি মনে পড়ে—না, এমন করিয়া অকারণে মরিলে চলিবে না। এবারের যুদ্ধে লাভের যে-আশা স্বর্ণমৃগের মতো তাহাকে ছলনা করিয়া পালাইয়াছে—ধরিতে পারেন নাই—আগামী মহাযুদ্ধে তাহাকে করায়ত্ত করিতে হইবে। এই মহৎ সঙ্কল্প মনে হইবামাত্র তাঁহার জীবনের আসক্তি আবার ফিরিয়া আসে। অমনি তিনি জীবনের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া ধ্যানস্থ হন। এমন সময় তাঁহার গৃহিণী রূপার বাটিতে বিশুদ্ধ রবিনসন বালি লইয়া উপস্থিত হয়। তিনি তাহা নিঃশেষে পান করিয়া—একটি তৃপ্তির 'আঃ' শব্দ করিয়া শুইয়া পড়েন। ঘুমাইয়া তিনি টিকটিকির স্বপ্ন দেখেন—তাহার রংটা সোনার! আগামী যুদ্ধের আশায় অন্নদাবাবু অন্নকষ্ট সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছেন। ইহাই তাঁহার অন্নকষ্টের ইতিহাস।

ষ্টেশনে

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল ঠিক কুড়ি বৎসর আগে এই সময়-টাতেই এই পথে একবার সে গিয়াছিল। সাঁওতাল পরগণা হইতে পুরুলিয়া হইয়া রাঁচি। তখন ছিল পূজা শেষের হেমন্তকালের একটি রাত্রি। এবারেও সেই সময়। সেদিনও আকাশে খণ্ড চাঁদ ছিল, কেননা এখনো তাহার বেশ মনে আছে গাড়ীর জানালার কাছে বসিয়া ঝাপসা প্রকৃতির দিকে সে তাকাইয়া ছিল। চলন্ত গাড়ীর বেগে বাহিরের চলমান দৃশ্য একটা ঘোলা জলের ঝর্ণার মত বহিয়া যাইতেছিল। আজও আকাশে চাঁদ আছে—পূর্ণপ্রায়, আর দু'একটা তিথি পাড়ি দিলেই চাঁদটি নিটোল হইয়া উঠিবে। আজও গাড়ীর জানালার কাছে সে বসিয়া আছে। পাহাড়ী নদীর বেগে প্রাকৃতিক দৃশ্য গাড়ীর উজানে ছুটিয়াছে।

ইতিমধ্যে কুড়িটি বৎসর অতিবাহিত। এই কয় বৎসরে অতীশের জীবনে অনেকগুলি আঁক জোক পড়িয়াছে, অনেকগুলি ফাটাফুটি, কাটাছেড়া হইয়াছে। তাহার জীবনের গভীরতা বাড়িয়াছে, ঝর্ণা আজ নদী। যৌবনের প্রারম্ভে মানুষ যে উজ্জ্বল রঙে জীবনকে চিত্রিত করে তাহার সহিত প্রৌঢ়ত্বের গাঢ় রং কয়েক পোঁচ মিশিয়াছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান যেন এখন প্রবলতর ভাবে সে অনুভব করে।

কুড়ি বৎসর মানুষের জীবন-চক্রের সামান্য অংশ নয়। এই সময়ের মধ্যে সদ্যোজাত শিশু যুবক হইয়া ওঠে, যুবক প্রৌঢ় হয়, কত বৃদ্ধের পরিণত বয়স হইয়া জীবনান্ত ঘটে। এই সময়ের মধ্যে নারীর জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা আরও অভাবিত! সেদিনকার সপ্তদশীকে আজ আর চিনিবার উপায় কি? হয়তো তাহার সপ্তদশী কন্যার মুখে সেদিনকার মাতার ক্ষীণ স্মৃতির আভাস। অবাস্তব কাল-সত্তার মতো এমন বাস্তব মানুষের জীবনে আর কি আছে? হাওয়াকে দেখিতে পাই না, গাছের ডালে ডালে তাহার হাহাকার শুনি, পাতায় পাতায় তাহার লীলা খেলা দেখি কাল-সত্তাও তেমনি মানুষের জীবনের ডালে ডালে পাতায় পাতায় কি চাঞ্চল্য, কি লহরী কি আর্ত্তনাদ না ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে!

গাড়ীখানা একটা বড় জংশন ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। এখানে অতীশের গাড়ী বদল করিতে হইবে। সে নামিয়া পড়িল। জন-প্রবাহ এড়াইবার জন্য সে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ারে গিয়া বসিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর বসিবার ঘরের একটি বিশেষ গন্ধ আছে। সেই গন্ধে, কুড়ি বৎসর আগেকার সেই পুরাতন গন্ধে তাহার সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হইয়া উঠিল, তাহার জাগ্রত চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে দিবালোকের মত অবলুপ্ত হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্তে, একটি গন্ধের যাদুযষ্টির ইঙ্গিতে কুড়িটা সুদীর্ঘ বৎসর তাহার জীবন হইতে অপসারিত হইয়া খসিয়া পড়িল। অতীশ এখন হইতে তখনে চলিয়া গেল।

সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমের একটি স্বতন্ত্র গন্ধ আছে, সুগন্ধ

নয়। ফিনাইল, বার্ণিশ, বদ্ধ আবহাওয়ার মিশ্র গন্ধ। সেই গন্ধ কৌতূহলী অঙ্গুলিতে একটির পরে একটি বৎসরের পর্দ্দা তুলিয়া ধরে—আর অতীশ ক্রমেই দূর হইতে দূরান্তে চলিয়া যায়, স্মৃতির বীথিকা অন্তহীন।

তাহার মনে পড়িল—সে হঠাৎ একজনের উপর অভিমান করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কোথায় যাইতেছে নিজেও জানিত না। ষ্টেশনে আসিয়া যে গাড়ীখানা পাইল চড়িয়া বসিল। আজ আবার কুড়ি বৎসর পরেও অনুরূপ কারণে, একই পথে সে বহির্গত। আর ঠিক সেই পূর্ব্বতন পথ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে, নূতন ঘটনা পুরাতনের পথে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু একটু প্রভেদ আছে বই কি? এই জংশন ষ্টেশনটিই কি তাহার কাম্য স্বর্গ নয়? ষ্টেশন ছাড়িয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া গেলেই কি সব তাপ ও দাহ মিটিবেনা? খানিকটা লাল পথ, শিশু গাছের সারি, টালির গৃহ, মেহেদি গাছের বেড়া, ছোট একটি দরজা, ঝুমকো ফুলের লতা, দরজায় খট খট শব্দ, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠের প্রশ্ন ও ত্বরিত পদের দ্বার উন্মোচন······কিন্তু না, তা হইবার নয়। আজ তীরের কাছে আসিয়া, দ্বারের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে চোরের মত ফিরিয়া যাইতেই হইবে। উপায় নাই।

অতীশের মনে হইল মানুষের জীবন আকাশের অসংখ্য গ্রহ, সূর্য্য জ্যোতিষ্কের আবর্ত্ত পথের মতো চক্রাকারে ঘুরিতেছে। একই পথে বারে বারে সমে আসিয়া থামে, আবার নূতন

উৎসাহে পুরাতন আবর্ত্ত অনুসরণ করিয়া চলে। আজ কুড়ি বৎসর পরে একই রাগিণী তাহাকে একই সমে আনিয়া স্থাপন করিয়াছে। সম্মুখে আবার অন্তহীন রাগিণীর বৃত্ত।

তাহার গরম বোধ হইতে লাগিল, সে দরজার বাহিরে প্ল্যাটফর্ম্মের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। কুয়াশা অনেকটা কম, আকাশ পরিষ্কার, চাঁদের আলো উজ্জ্বল। দূরে ওটা কি? পাহাড় নাকি? সেদিন তো চোখে পড়ে নাই। পাহাড়টা অবশ্যই ছিল, কিন্তু সে দেখিতে পায় নাই। রাত্রি কত? শেষ রাত্রি বোধ করি। আর একটু পরেই জাগরণের প্রথম সাড়া পড়িবে। ঝি চাকর উঠিয়া উনুনে ধোঁয়া দিবে, পাড়ার সম্মিলিত ধোঁয়ার সহিত ভোরের কুয়াশা মিশিয়া ঘনতর হইবে, তার পরে একে একে ধীরে একটা দু'টা করিয়া দরজা জানালা খোলার পালা। দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের প্রথম অস্ফুট সূচনা। কিন্তু তার আগেই তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। সাড়ে চারিটায় তাহার ট্রেণ।

অতীশের ট্রেণ ধীরে ধীরে ঘুমন্তভাবে ষ্টেশনে আসিয়া লাগিল —এই ষ্টেশন হইতেই গাড়ীখানা ছাড়ে। সে মূঢ়ের মতো একটা অন্ধকার কামরায় উঠিয়া বসিল—তখনো বাতি জ্বলে নাই। যখন তাহার হুঁস হইল—গাড়ী চলিতেছে। তখনো চারিদিক অন্ধকারে ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন, চাঁদ অস্ত গিয়াছে। তাহার মনে হইল সে যেন একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। জীবনে যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু কাম্য, সমস্তই পিছনে পড়িয়া রহিল। পাইয়াও পাওয়া হয় না, কাছে আসিয়াও

ধরা যায় না, স্পর্শ করিলেও করায়ত্ত হয় না—ইহাই কি জীবনের নিয়ম ! কিম্বা কে বলিতে পারে—পাইলে, ধরিলে, করায়ত্ত হইলে আরও বেশী দুঃখ হয় ? জীবনের পথ দুই দুঃখের অন্তঃশায়ী। যত ভাগ্যবানই হওনা কেন, এক সঙ্গে কখনোই দুটোকে এড়াইয়া চলিতে পারিবে না। ইহাই যদি সংসারের নিয়ম, তবে আর অতীশের দুঃখ কি ? কিন্তু মন তবু যে সান্ত্বনা মানে না।

হাতুড়ি

বনগাঁ ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছি। বেলা পাঁচটার ট্রেণে আমার এক বন্ধু আসিবে তাহারই জন্য এই প্রতীক্ষা। এখন কেবল বেলা এগারটা। সমস্তটা দুপুর এবং বিকালের অর্ধেকটা এখনো সম্মুখে পড়িয়া—আর সম্মুখে পড়িয়া দক্ষিণ বাঙলার একটি ক্ষুদ্র রেলষ্টেশনের অসহনীয় পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে ষ্টেশনটিতে যাহা দেখিবার সমস্তই একাধিকবার দেখিয়া লইয়াছি। দুইটি চায়ের ষ্টল আছে, দুইটিতেই একাধিকবার চা-পান করিয়াছি। প্রত্যেক পানওয়ালার নিকট হইতে এক-এক খিলি পান খাইয়াছি। যাত্রীদের সুখদুঃখের বিশ্রম্ভালাপ উপচাইয়া আসিয়া কানে প্রবেশ করিয়াছে—তাহাতে বুঝিয়াছি তেল, চিনি, গুড়, চাউল, আটা, সমস্তই দুষ্প্রাপ্য।

একজন বলিল—এই দেখো না কেন বেগুন। এখান থেকেই চালান যায়, অথচ কলকাতায় গিয়ে কেনো তিন আনা সের, এখানে পাঁচ আনার কমে পাও তো কি বলেছি!

তাহার শ্রোতা বলিল—কলকাতার সুখসুবিধাই আলাদা!

তাই কি! তবে আমি কলকাতার লোক হইয়া এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া আছি কেন?

ছেলেদের তিন-চারটি ক্ষুদ্র দল খাতা-পেন্সিল লইয়া আসন্ন সরস্বতী পূজার চাঁদা আদায় করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে আসিয়া ধরিল। এখানকার লোক নই বলিয়া এড়াইয়া গেলাম।

একটি বালক বলিল তাতে ক্ষতি কি স্যার? সরস্বতী তো সব জায়গারই। সরস্বতীর এমন বরপুত্রকে নিরাশ করা চলে না। কিছু দিতে হইল। তবে বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম যে, অন্য দলের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। তাহারা রাজি হইল। পাছে অপর দল আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে, একজন আমার সঙ্গে Body-guardরূপে রহিয়া গেল। ছেলেটি বীরপুরুষ, কাহাকেও আমার কাছে ঘেঁষিতে দিল না। সাধে কি কার্তিককে সরস্বতীর ভ্রাতা বলা হইয়া থাকে!

উজান-ভাটির গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। ধোঁয়া, শব্দ, গাড়ী, যাত্রীর ভীড় এবং কোলাহল। কুলি, টিকিট-চেকার, নীল-নিশান—আবার ধোঁয়া ও শব্দ। গাড়ী চলিয়া যাওয়ার শূন্যতা। এই ছবির পর্য্যায় কিছুক্ষণ পরে পরেই।

চারিদিকের মাঠে শীতের মধ্যাহ্নের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অবশ্যই আছে—কিন্তু কয়েক পেয়ালা গৌড়ী চা মাত্র পান করিয়া এবং সারাদিনের অনাহার ও বিশ্রামাভাব সম্মুখে করিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিবার মতো মানসিক অবস্থা কাহার থাকে—অন্তত আমার তো নাই। তাহার চেয়ে ষ্টেশনের দেয়ালে সংলগ্ন মুদ্রিত ও হস্তলিখিত কাগজের বিজ্ঞাপনখণ্ডগুলি পড়িতেছি—আর অবাধ্য চক্ষু দুইটা ঘুরিয়া ফিরিয়া ষ্টেশনের কক্ষনিবাসিনী মৃদুভাষিণী সেই তাহার দিকে গিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক-বার ভাবিয়াছি আর তাকাইব না, লাভ কি, কেবল মনঃকষ্ট ছাড়া আর কিছুই তো নয়। কিন্তু অবোধ মন বোঝে না, অবাধ্য চক্ষু কথা শোনে না, ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মুখ-চন্দ্রমার প্রতি ধাবিত হয়। কবিরা যে

মুখ-চন্দ্রমা বলিয়াছেন, তাহা একেবারেই অতিশয়োক্তি নয়। চন্দ্রের গোলিমা, চন্দ্রের শুভ্রতা, চন্দ্রের সকলঙ্ক লাবণ্য সবই আছে, তবে মুখ-চন্দ্রমা নয় কেন? আবার লজ্জারও অভাব নাই। মৃদুভাষিণী, মৃদুগামিনী! মান কক্ষের দেয়াল সংলগ্নিকা ঘটিকাটি। পাঠককে বোধ করি নিরাশ এবং পাঠিকাকে বোধ করি বিস্মিত করিলাম। কিন্তু আমিও কম নিরাশ হই নাই— এবং বিস্ময়ের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করিতে বসিয়াছি।

একজনের ফাউন্টেন পেন হারাইয়াছে। কেহ সেই কলমটা পাইয়া থাকিলে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া মালিক নিজের নাম ও ঠিকানা বিজ্ঞাপিত করিয়াছে। লোকটা এখনো যুদ্ধপূর্ব্ব জগতে বাস করিতেছে। কলম হারাইলে তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করাও পণ্ডশ্রম। তাহা ছাড়া সবই বুঝিয়া লইবে লোকটার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। বেচারা নিজের হাতে নিজের বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব সব সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছে। অতঃপর তাহার ঘরবাড়ী, জমি-জমা বেহাত হইলে বিস্মিত হইব না।

এটা আবার কি? খবরের কাগজের জমিতে লালে-কালোতে ডোরা-কাটা মস্ত বিজ্ঞাপন। অন্যান্য ছোট-খাটো বিজ্ঞাপনের মধ্যে এ যেন একেবারে ডোরা-কাটা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। "আজ পোষ্টাফিসের নিকটবর্ত্তী মাঠে বেলা দুই ঘটিকায় সহস্র সহস্র শ্রমিকের রুষ্ট হাতুড়ির আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা হইবে। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত শ্রমিক-শিল্পী, ধনিক-বিভীষণ বি-রক্ত নেতা···আসিবেন। আসুন সকলে সমবেত হইয়া সাম্রাজ্যবাদের শেষকৃত্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করুন।" বাপরে!

এই বিজ্ঞাপনের পরেও কি আর সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়া থাকিতে পারে ? কখনো তাহাকে চোখে দেখি নাই। আজ তাহাকে দেখিবার প্রথম ও শেষ সুযোগ। এমন সুযোগ ছাড়া চলে না। যাইব পোষ্টাফিসের ময়দানে। বেলা দুইটা। আমার গাড়ীর সময় পাঁচটা। তিন ঘণ্টার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের প্রাণ কি বহির্গত হইবে না—এত কি শক্ত তাহার প্রাণ, বিশেষ হাতুড়িটা যখন রুষ্ট !

[২]

এমন সময়ে ষ্টেশনে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কলিকাতার ট্রেণ আসিতেছে। কোথা হইতে পাঁচ সাত বছরের একদল ছেলে ছোটখাটো একটি লজঞ্চুষ ব্যাটেলিয়ান প্ল্যাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে তাহাদের নিশান, সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্ত্ত ঘোষণাকারী শ্লোগান-লিখিত প্ল্যাকার্ড এবং একখানি লাল কাপড়ের উপরে অঙ্কিত এক জোড়া কাস্তে হাতুড়ি রাধাকৃষ্ণের ভঙ্গীতে পরস্পরকে জড়াইয়া বিরাজমান। তাহারা তারস্বরে ধনিক সভ্যতার ধ্বংস ঘোষণা করিতে লাগিল। সামান্য কয়েকজন ছোট ছেলে কি এত চীৎকার করিতে পারে ! বাঙালীর ছেলে বটে ! তাহাদের পিছনে জন দুই বয়স্ক ছোকরা। একজনের হাতে একটি ফুলের মালা। বুঝিলাম ইহারা শ্রমিক-শিল্পী নেতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ট্রেণ আসিয়া থামিল। গাড়ী হইতে কয়েকজন যাত্রী গুড়ের হাঁড়ি, ফুলকফি প্রভৃতি লইয়া নামিল। কিন্তু শ্রমিক-শিল্পী কোথায় ? সকলে এদিক ওদিক ছুটাছুটি

করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িল। ট্রেণ চলিয়া গেল। লজঝুড় ব্যাটেলিয়ান পূর্বশিক্ষা মতো 'নেতার জয়' হাঁকিয়া চলিল। নেতা আসে নাই—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? বয়স্ক ছেলে কয়টি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া রহিল এবং অবশেষে একান্তে সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি চিন্তা করিতে লাগিল। আমি দূরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা ও দেয়ালের ঘড়িটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বয়স্ক ছেলে কয়টি আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—এবং একটা নমস্কারের অপভ্রংশের মতো করিয়া বলিল—স্যার, একটা কথা আছে। আমি মুখ তুলিয়া তাকাইলাম।

একজন বলিল—স্যার, আপনি তো এখানকার লোক নন।

আমি বলিলাম—না।

অপর একজন বলিল—আপনাকে তো এখানে কেউ চেনে না।

আমি পুনরপি বলিলাম—না।

তখন সাহস পাইয়া পূর্বোক্ত বক্তা বলিল—স্যার, আমাদের ঠেকা কাজটা যদি চালিয়ে দেন।

—কি কাজ?

—কাজ এমন কিছু না। আমাদের সভায় গিয়ে একটা বক্তৃতা করবেন।

আমি বলিলাম—কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ কি ভাবে ধ্বংস করতে হয় তা তো আমার জানা নেই।

তখন তাহারা সমস্বরে বলিল—কারই-বা জানা আছে ? ওটা একটা সিম্‌বল ছাড়া কিছু নয়।

—কিন্তু আপনাদের লীডার এলেন না কেন ?

একজন সলজ্জভাবে বলিল—আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আস্‌লে আর লীডার হবেন কেন ?

—তিনি বোধ হয় অন্য কোন সভায় গিয়েছেন।

—কিম্বা খুব সম্ভবত কোথাও পিকনিক করতে গিয়ে থাকবেন।

আমি বলিলাম—আমি তো লীডার নই।

সপ্রতিভভাবে একজন বলিল—সেইজন্যই তো আপনার কাছে এসেছি। লীডার হলে কি আপনাকে এত সহজে পেতাম।

—কিন্তু পুলিশ টুলিশ ?

সকলে সমস্বরে বলিল—আজ্ঞে, না। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের অনুমতি আগে থেকেই নিয়েছি।

অপর একটি ছেলে চোখে কৌতুক কণিকা বর্ষণ করিয়া বলিল—জানেন তো স্যার—This is Politics.

ঠিক জানিতাম না। যাই হোক আমার ট্রেণের এখনো অনেক দেরী। ছেলেদের হতাশ করিতে পারিলাম না। রাজি হইলাম। বিশেষ, আপোষে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয় তাহা দেখিবার কৌতূহলও মনে ছিল।

আমি রাজি হইবা মাত্র, সেই গাঁদা ফুলের মালাটি একজন আমার গলায় পরাইয়া দিল। লজঞ্চুষ ব্যাটেলিয়ান—শ্লোগান হাঁকিয়া উঠিল। এইভাবে, অপ্রত্যাশিতভাবে নেতৃত্বের পথে

প্রথম পদ-বিক্ষেপ করিলাম। লজঞ্চুষ ব্যাটেলিয়ান শ্লোগান হাঁকিতে হাঁকিতে চলিল। একটি ছেলের গলা চিরিয়া খানিকটা শ্লেষ্মার মতো পড়িল। আমি বলিলাম—তোমার কাশি হয়েছে, তুমি থামো। অপর একটি ছেলে বলিল—ওটা কাশি নয় স্যার। ও এখনি দুধ খেয়ে এসেছে—তাই উঠলো। দুধই বটে! তবে তাহার বয়স বিবেচনা করিলে মাতৃদুগ্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়। আমি লীডার নই, কিন্তু তাহাদের অনেকবার দূর হইতে দেখিয়াছি, সেইভাবে, সেই চালে চলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজ্ঞাপনে ঘোষিত সেই পোষ্টাফিসের মাঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই সেই জনস্থান, এই সেই নূতন পাণিপথের মাঠ সেখানে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বসিয়া পড়িবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের উপকরণের অল্পতা দেখিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গেল। খানকতক টুল ও চেয়ার, গোটা দুই নিশান, আর পঁচিশ ত্রিশ জন মিশ্র বয়সের ও অমিশ্র শ্রেণীর লোক! কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! হৃদয়ে আশা অপরিমিত থাকিলে উপকরণের অল্পতা চোখেই পড়ে না। গ্যালিলিও মাত্র দুইখণ্ড চশমার কাঁচের সাহায্যে নূতন জ্যোতিষ্ক জগৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন!

আমি একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট হইলে একটি বয়স্ক ছেলে আরম্ভ করিল—কমরেডগণ—[বাকি অংশের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পত্রান্তরে নিত্য প্রকাশিত হইতেছে।] বক্তৃতা করিতে করিতে হঠাৎ সে স্বর নীচু করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, স্যার, আপনার নামটা?

নামটা বলিলাম।

তখনই আবার সে আরম্ভ করিল—বিখ্যাত শ্রমিক-শিল্পী, প্রখ্যাত নেতা..............আজ এসেছেন। ইনি প্রায় সাতাশ বৎসর ধরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। ধনতন্ত্রের হাতে তিনি যে কত অত্যাচার সহ্য করেছেন—তা আপনারা সবাই জানেন। তারপরে সে আমার যে-সব গুণাবলী বলিয়া গেল তাহা এতাবৎ আমারও অজ্ঞাত ছিল।

অতঃপর আমার বক্তৃতার পালা। কিছুক্ষণ আগেও জানিতাম না সাম্রাজ্যবাদ কেমনভাবে ধ্বংস করিতে হয়। কিন্তু এখন দেখিলাম এমন সহজ কাজ আর নাই। সবেগে বক্তৃতা করিয়া চলিলাম। যেখানে গভর্ণমেণ্ট ও পুলিশের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলাম, দেখিলাম ঠিক সেইখানেই জনতার [কতজন মিলিত হইলে হয় ?] মধ্যে উপস্থিত একজন পুলিশ হাততালি দিয়া উঠিল। সাহস বাড়িয়া গেল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বহু প্রকার কটূকাটব্য করিলাম। লোকটা ভালো করিয়া হাততালি দিবার উদ্দেশ্যে হাতের খৈনি মুখে ফেলিয়া দিয়া দুই হাত খোলসা করিয়া লইল। আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। এমন সময়ে একটি বয়স্ক ছেলে আমার কানের কাছে সভয়ে বলিল—স্যার ও কথাগুলোর Sanction নেওয়া হয়নি, ওসব নাই বললেন।

ইস্, এখনি থামিব ? সাম্রাজ্যবাদ কেবল অর্ধভগ্ন হইয়াছে—আর ঘা দু'য়েক দিলেই হয়। কিন্তু উদ্যোক্তাদের নির্বন্ধাতিশয্যে সাম্রাজ্যবাদের সৌধকে পীসার 'লীনিং টাওয়ারের' মতো শূন্যে

কাৎ করিয়া রাখিয়া বসিতে বাধ্য হইলাম। লজঞ্চুষ ব্যাটেলিয়ান সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ও আমার জয় হাঁকিয়া উঠিল।

সভা ভাঙিল। আমি বিদায় লইয়া ষ্টেশনে আসিলাম। প্রত্যাশিত ট্রেণে চড়িয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। আমার বক্তৃতার পূর্ণ রিপোর্ট দেওয়া বাহুল্য—কারণ পত্রান্তরের ঔদার্য্যে তাহা মোটা অক্ষরের হেড লাইনে এখন সর্বজনবিদিত।

এখন আমি একজন ষোলকলায় বিকশিত লীডার। বাম হাত তির্যকভাবে কোমরে রাখিয়া রক্তশোষণকারী ধনিক সম্প্রদায়ের অদৃশ্য নাসিকার অভিমুখে দক্ষিণ হস্তের উদ্যতমুষ্টি আমার ছবি কে না দেখিয়াছে? দূর ও নিকট বহুস্থান হইতে বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ আমার আসে। কোথাও যাইতে অস্বীকার করিলে পরিচিতেরা অনুযোগ করিয়া বলে—কোন্ বনগাঁর সভায় যেতে পারো—আর এখানে পারো না? এখানে যে শ্রমিকের রক্তে হোলিখেলা চল্‌ছে। যাইতেই হয়—কারণ হোলিখেলার অলঙ্কারটা আমার কারখানাতেই প্রস্তুত। এক একদিন গভীর রাত্রে নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া ভাবি, এই স্বরচিত ফাঁদ হইতে কি উপায়ে মুক্তি পাইব? হায় কি কুক্ষণে বনগাঁয়ে গিয়াছিলাম। কিন্তু উপায় নাই—কর্মজাল হইতে এত সহজে নিষ্কৃতি কোথায়? মুড়ি ও নারিকেল খাইবার উপদেশ দিবার ফলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আর যেমন প্রকাশ্যে সন্দেশ খাইবার উপায় ছিল না—আমারও অনেকটা তেমনি ঘটিয়াছে।

এমন সময়ে 'নোয়াখালি' ঘটিল। ভাবিলাম বুঝি সেখানে যাইতে হয়। কিন্তু দেখিলাম ভয় অকারণ। আগে ঝামেলা

কাটিয়া যাক্। ব্যাপারটা যে সংখ্যালঘিষ্ঠের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠকে অপদস্থ ও বিব্রত করিবার জন্যই তাহারা নিজেদের ঘর-বাড়ী পোড়াইয়া এই কাণ্ডটি করিয়াছে—এমন একটা 'থিওরি' খাড়া করিতে পারিলেই আবার আমি বক্তৃতা আরম্ভ করিব—আবার আমার ছবি প্রকাশিত হইবে—আবার হাততালি পাইব, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, এবার আর সামান্য পুলিশ নয় – অনেক উচ্চ হইতে হাততালি আসিবে। আমার হাতও শূন্য থাকিবে না।

সমাপ্ত